
আনন্দমেলা
…নুয়ারি ১৯৮০
১
…বাজার-প্রকাশন



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড : ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


দুষ্টুমী করার এইতো বয়স
অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন, হাজার দুরন্তপনা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অটুট থাকবে
বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমী করবে এটাই তো স্বাভাবিক। রোদে খেলবে, বৃষ্টিতে ভিজবে, খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে এটাই তো নিয়ম। এতে ভাবনার কিছু নেই। সারা বছর নিয়ম করে অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন। এই তেলের 'এ' ও 'ডি' উপাদান শরীরকে দুরন্তপনার সব চোট থেকে বাঁচাবে। ত্বক খসখসে হতে দেবে না, হাড় মজবুত করবে।
ADVITAMIN
FOR GROWTH AND VIGOUR OF THE BABIES
AD
VITAMIN
MASSAGE OIL FORTE
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

আনন্দমেলা

১৬ মাঘ ১৩৮৬ • ৩০ জানুয়ারি ১৯৮০ • ৫ বর্ষ • ১৮ সংখ্যা

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাণ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

এক দৌড়ে গৌড়

সোমনাথ চক্রবর্তী

সাতসকালে কাক ডাকার আগেই কাঁচা ঘুমের দফারফা। দরজায় একনাগাড়ে কড়া নাড়ছে কে যেন! দরজাটা খুলতেই দেখি টাঙ্গাওয়ালা, একটা লম্বা সেলাম দিয়ে বলল, "গাড়ি তৈরি সাব।"

গরমের দিন, গৌড় যেতে যেতে বেলা বেড়ে যাবে, তাই বেরোতে হলে আর এক-মিনিটও দেরি নয়। কথায় বলে, ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা—টাঙ্গাওয়ালারও ঠিক তাই। চুলোয় গেল খোশ মেজাজে সকালবেলার খাওয়া-দাওয়া। চুলের মধ্যে গোঁজাই রইল চিরুনি, গায়ে বোতামখোলা শার্ট, হাতে কামড়বসানো টোস্ট নিয়েই রাস্তায় নেমে পড়ি। দেখি ছুঁচলো-দাড়ি টাঙ্গাওয়ালা দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে আর এক রাউন্ড ঘুম দিচ্ছে। জুতোর আওয়াজ পেয়েই লাফ দিয়ে উঠে গাড়িতে চাপল। জোরসে চাবুক পিঠে পড়তেই পক্ষিরাজ ছুটল।

মালদহ শহরের ঘিঞ্জি ভাবটা একটু বাদেই হালকা হয়ে গেল। দুপাশে যেন সবুজ আর হলুদ রঙের দাবার ছক বিছানো। ফসলের খেত, মাঝেমধ্যে নামজাদা সব আমের বাগান। রাস্তার দুধারেও আমের গাছ সারি সারি, এক-একটা নুয়ে পড়েছে ঝাঁক-ঝাঁক ইয়া বড়-



দখল দরওয়াজা

বড় আমের ভারে। অত সকালেও গাছের আশেপাশে গুলতি নিয়ে, আঁকশি হাতে খুদেদের জটলা। থুত্থুড়ে বুড়িরাও এসেছে ঝুড়ি নিয়ে। বেশ চলছিলাম, হঠাৎ গাড়ির দৌড় এল কমে। কী হল! মুখ বাড়াতেই দেখি চোখের সামনে রাস্তার যদ্দুর দেখা যায় তদ্দুর শুধু গরু আর মোষ। ব্যাপারখানা কী? টাঙ্গাওয়ালা বলল, সাতসকালে রাখাল ছেলেরা নিজেদের গরু-মোষের পাল মাঠে নিয়ে যায় এমনিভাবে। আশেপাশের গ্রামের হাজার-হাজার গরু-ভেড়া এমনি করে একসঙ্গে চলে রাস্তা জুড়ে। কী মুশকিল! টাঙ্গাওয়ালা বারবার হ্যাট-হ্যাট করে, তবু নট নড়নচড়ন। মাঝ রাস্তাতেই শুয়ে জাবর কাটছে। দূরের উঁচু ঢিবিগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে টাঙ্গাওয়ালা বলে, "একটু এগোলেই গৌড়।"

কিন্তু, এ-ভাবে গাড়ি যাবে কতক্ষণে? শেষে ঠিক করি, পায়ে হেঁটেই রাস্তাটুকু পেরিয়ে গৌড়ে পৌঁছে যাব। পেছনে আসুক টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি নিয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে শিংওলাদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। দূরে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুটো রাখাল ছেলে শুয়ে। হাতে বাঁশি। কাছে গিয়ে হাতছানি দিয়ে একজনকে ডেকে বলি, "সঙ্গে করে গৌড়ে নিয়ে যাবে খোকা?" দু-ভাইই একপায়ে খাড়া, কিন্তু মুশকিল বাধে গরু-গুলোকে নিয়ে। ওদের তাহলে দেখবে কে? শেষকালে ছোট ভাই বলে, "হেই দাদা, তুইই যা। এসে গপ্পো শোনাস কিন্তু!"

চওড়া রাস্তা ছেড়ে আলের পথে পা বাড়ায় ছেলেটা। ততক্ষণে ওর নামধাম জেনে গেছি। মাইলদেড়েক দূরেই বাংলাদেশের সীমান্ত, তাই পেরিয়ে কালিন্দী নদীর চরে ওদের গ্রাম। মা নেই, বাবা মজুর। শ্লেট-পেন্সিলের সঙ্গে চিরকালের আড়ি। গরু চরায়, মনিবকে খেতে ভাত দিয়ে আসে দুপুরে. আমবাগান আগলাতে ভর-দুপুরে ভূতের ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপে।

এগোতে এগোতে ছেলেটি বলে, "দেখ গো, গৌড়ে পা দিনু। ঐ যে হাতিবাঁধার থাম।"

ওমা! পেল্লায় দুটো পাথরের স্তম্ভ

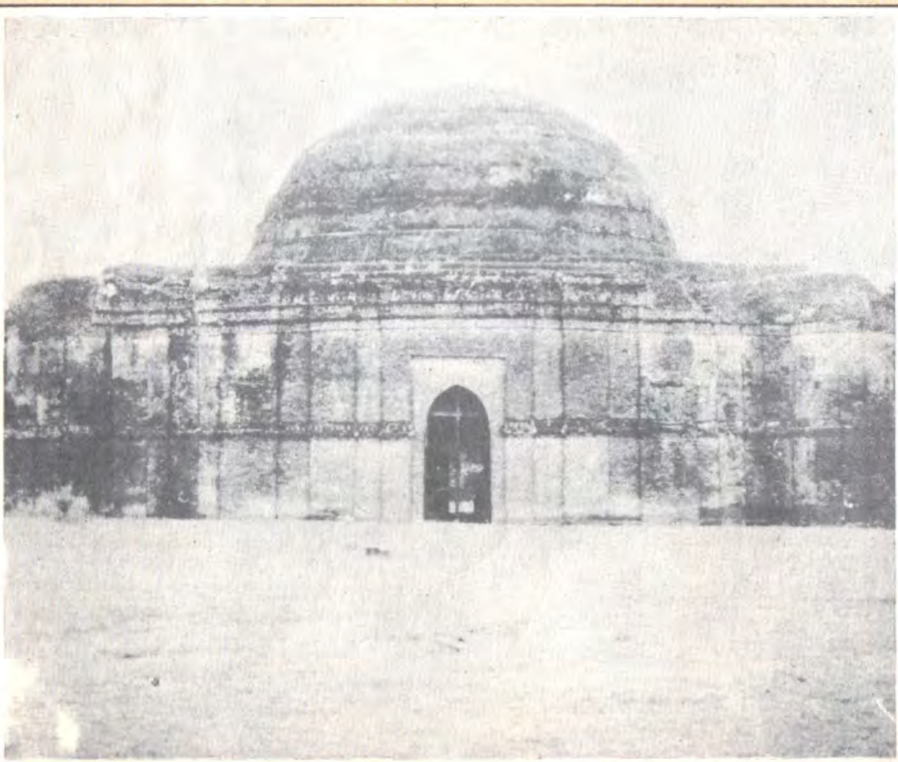


গৌড়ে যাবার পথ

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া, একপাশে সরকারি প্রত্নবিভাগ থেকে লাগিয়ে দেওয়া বোর্ড রয়েছে। এককালে রাজাদের হাতিশাল ছিল এ জায়গাতেই। পাথরের থাম দুটোর গায়ে হাতি থাকত বাঁধা। রাজা নেই, রাজত্ব নেই, হাতিরাও মরে ভূত হয়ে গেছে কবে ; তাই গাঁয়ের মেয়েরা এখন ঘুঁটে দেয় তার গায়ে। হাতিবাঁধা থামের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গ্রামের ভেতরে। ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলেছে। ওর সঙ্গে তাল রেখে ডবল মার্চ করতে করতে এসে পৌঁছলাম রামকেলিতে। ছিমছাম একটা বোষ্টমদের আখড়া। রাতদিন নামগান, অষ্টপ্রহর খোল-করতাল বাজে মদনমোহনের মন্দিরে। এই রামকেলিতেই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে এসে দুই বড় ভক্ত রূপ আর সনাতনের দেখা পেয়েছিলেন। মন্দিরে চৈতন্যদেবের পাশেই তাই রূপ-সনাতনের মূর্তি দুবেলা পুজো হয়। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠের শেষে রামকেলিতে বিরাট মেলা বসে। ওদিকে দেখি ছেলেটি বোষ্টম বাবাজিদের হাত থেকে ক্ষীরের নাড়ু, মুড়ি-বাতাসার প্রসাদ নিয়ে কোঁচড়ে বাঁধছে। আখড়ার পাশেই ঝাঁকড়া গাছের নীচে এক-টুকরো কালো পাথরের ওপরে একজোড়া আবছা পায়ের ছাপ। লোকে বলে ওটা চৈতন্যদেবের। গুটিকতক বুনো ফুল কে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ওপরে।

পুরনো গৌড়ের ইতিহাস আজকের নয়। সেই আড়াই হাজার বছর আগে পাণিনি নামে এক পণ্ডিতের লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণে গৌড়ের কথা রয়েছে। এক সময় বাংলার রাজধানীও ছিল গৌড়। উত্তর বাংলা থেকে দামোদরের কাছ অবধি বিরাট রাজ্যের নাম ছিল 'পুণ্ড্র' বা গৌড়। সবচেয়ে মজা কি, এক সংস্কৃত কবি বলেছিলেন গৌড়ের লোকজনকে দেখতে ছিল ভারী সুন্দর, আর সেকালে তখনকার ছেলেদের মধ্যে ফ্যাশান চালু ছিল লম্বা-লম্বা নখ রাখা।

গৌড়ে পুরনো ভাঙাচোরা মসজিদ



...কা মসজিদ

রয়েছে অনেকগুলো। তার মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা বড়সোনা মসজিদ, লোকে বলে বারোদুয়ারি মসজিদ। বিশাল-বিশাল পাথরের তৈরি বারোটা ফটক মসজিদের চারধারে, তার থেকেই এই নাম। এখন অবশ্য শুধু এগারোটা দরজা রয়েছে। মসজিদের গায়েই বোর্ডে লেখা রয়েছে ১৫২৬ সালে হুসেন শাহর ছেলে নসরত সুলতান তৈরি করিয়েছিলেন এটা। বড়সোনা মসজিদ ছাড়িয়ে দু'পা হাঁটলেই দূরে থেকে চোখে পড়ে আর-এক বিশাল ফটক—দখল দরওয়াজা। পুরোটা লাল নক্শাদার ইঁটে গড়া। গেটের ভেতর দিকটা ফাঁকা হলঘরের মতো, চিৎকার করলে গমগম করে ওঠে। দিনের বেলাতেও কানে তালা-ধরানো ঝিঁঝির ডাক। পুরনো ইঁটের—আনাচে-কানাচে বাদুড় চামচিকের আড্ডা, সাপখোপ থাকাটাও বিচিত্র নয়।

দখলদরওয়াজাই বোধহয় সে সময়ে গৌড়ে ঢোকবার দরজা ছিল, কেননা তার দুপাশ দিয়েই পাহাড়ের মতো উঁচু ঢিবি। ঢিবির নীচেই শুকনো পরিখা। জায়গাটা ভারী সুন্দর। ঝিলের জলে পদ্মের বাগান. গন্ধে ম-ম করছে। মুরশেদ থমকে দাঁড়ায়, তারপর একছুটে কোমরসমান জলে নেমে একগোছা পদ্ম তুলে আনে। পদ্মের বন পেরিয়ে ঝাঁকড়া বটের মাথা ছাড়িয়ে মনুমেণ্টের মতো একটা উঁচু মিনার। নাম ফিরোজ মিনার। মিনারের ভারী দরজা সবসময় খোলাই থাকে, ভেতরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে মিনারের মাথায় উঠলেই খোলা বারান্দা। মাইলের পর মাইল চোখের সামনে পরিষ্কার ছবির মতো ভাসে, দূরে দেখা যায় লোটন মসজিদ।

গাঁয়ের কুয়োর জলে তেষ্টা মিটিয়ে এরপর চলেছি কদম রসুল মসজিদে। প্রায় সাড়ে-চারশো বছরের পুরানো মসজিদের গম্বুজে এখন বটের চারা গজিয়েছে। দু'কদম এগিয়েই আওরঙ্গজেবের নাতি ফতে খাঁর সমাধি। জুতো খুলে ঢুকতে হয় ভেতরে। মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয় যাত্রীরা অন্ধকার নির্জন কবরে।



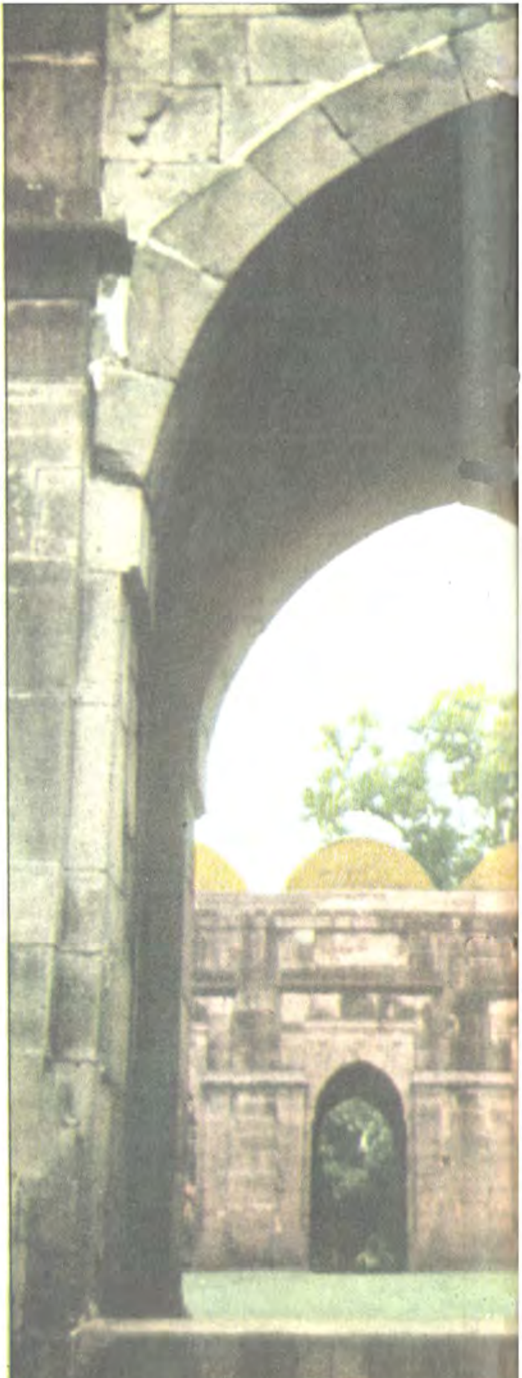
মদনমোহন মন্দির

গৌড় আর পাণ্ডুয়ায় খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে মাটির তলা থেকে যে-সব মূর্তি, ভাঙা মাটির পাত্র বা নকশাদার ইঁট পাওয়া গেছে, সে-সব কিছু সাজানো আছে চামকান মসজিদের চত্বরে গুমটি-ঘরে। চিকা বা চামকান মসজিদে এখন নমাজ পড়া হয় না। মসজিদের গায়ে এখনও ইঁটের ওপরে মিনের কাজে রয়েছে বাহারি ফুলপাতার নকশা। সরকার থেকে সব সারানোর কাজ চলছে।

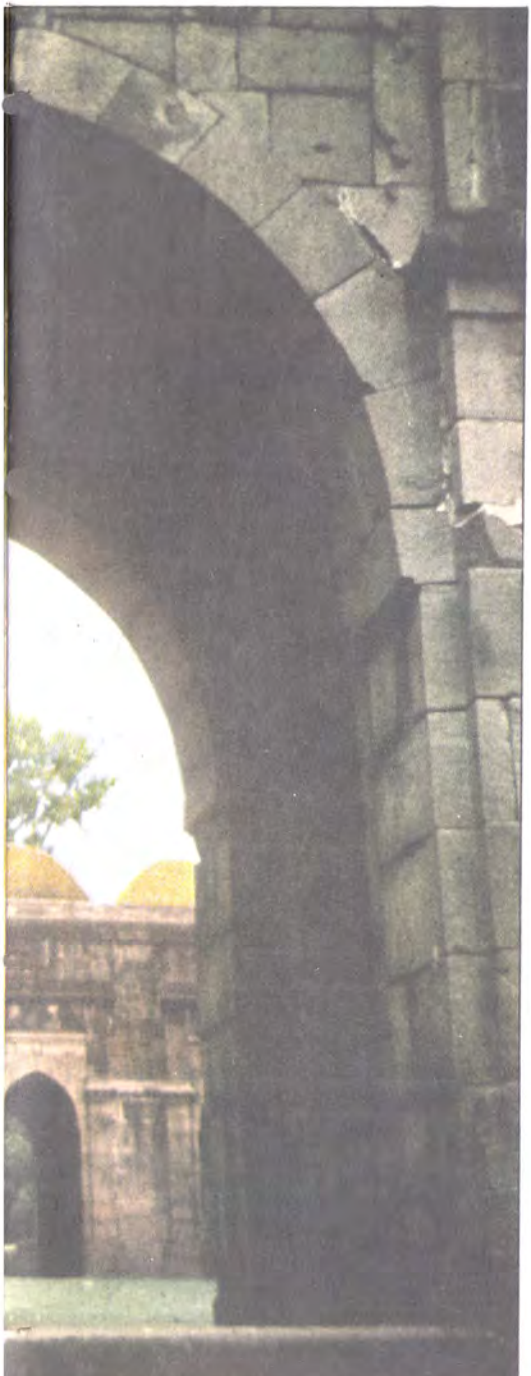
দুজনে টো-টো করে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল ছিল না, দুপুর গড়িয়ে এসেছে কখন। পেটে ইঁদুরের ডন-বৈঠক। দূরে রাস্তার দিকে মরূদ্যানের মতো গোটা দুই দোকান শুধু। পেছন থেকে একটা গরুর গাড়ি হেলে-দুলে



াতি-বাঁধার থাম



বড়সোনা মসজিদের প্রবেশপথ



চলছিল সেদিকে। সেটাকে থামিয়ে উঠে পড়ি। গরুর গাড়ির ছইয়ের নীচে গাদা গাদা বাক্স-প্যাটরা আর কতগুলো কিম্ভূতকিমাকার মুখোশ—রাক্ষস, কালী, শিব, হনুমান আরও কত কী! জিজ্ঞেস করতেই গাড়োয়ান বলল, "গম্ভীরা নাচের দল এটা। দূরের গাঁয়ে চলেছে, রাত্তিরে পালা হবে।"

কথায়-কথায় বড় রাস্তায় পৌঁছে যেতেই দেখি সামনেই গাছের ছায়ায় টাঙ্গাটা দাঁড়িয়ে। টাঙ্গাওলা গদিতে চিতপাত, ঘোড়াটাও চোখ বুজে দাঁড়িয়ে। দুজনেই আরামে নাক ডাকাচ্ছে। ছেলেটির নরম হাত দুটো শক্ত করে ধরি। এবার যাবার পালা।

ফোটো শান্তি সেন



ফিরোজ মিনার



রাজার মন ভাল নেই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রাজার মন আর কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। মন ভাল করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা-মচ্ছব, যাগ-যজ্ঞ পুজো-পাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ-বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীনে রসুইকররা দু' বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘন্টায় ঘন্টায় বুক কাঁপিয়ে হুহুংকারে এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। ''না হে, মনটা ভাল নেই।''

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়িঃ কখনও তেজি, কখনও মহা, কখনও মোটা, কখনও সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করেন, তারপর শতেক রকম শেকড়-বাকড় পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান। তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। "না হে, মনটা ভাল নেই।''

রাজার মন ভাল করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দী করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তার-পরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। ''মনটা বড় খারাপ রে।''

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলশকর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ'দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, "হায় হায়। মনটা একদম ভাল নেই।"

ওদিকে ভাঁড়ামি করে করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজ-নর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গন্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজ-পুরোহিত

হোম-যজ্ঞে এত ঘি পুড়িয়েছেন যে এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজ-জ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে কষে দিস্তা-দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলেছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল-বাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারো রকমের ফুলের বন্যা, রঙে গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দীঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে থেকে থেকে হঠাৎ সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, "গর্দান চাই।"

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়-বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, "কার গর্দান মহারাজ?"

রাজা লজ্জা পেয়ে বলেন, "দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।"

মন্ত্রী বললেন, "ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।"

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনোমতো একটা গর্দান দিলে বোধহয় মন ভাল হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভার কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।"

বিকেলবেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, হুক্কাদার, মন্ত্রী। পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুড়ির ঘরে আগুন দে! দে আগুন বুড়ির ঘরে।"

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, "যো হুকুম মহারাজ। শুধু বুড়ির নামটা বলুন।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "কী বললাম বলো তো!"

"আজ্ঞে, এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।"

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, "বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।"

সেইদিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, "বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।"

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।"

"বিছুটি!" বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, "পুঁতে ফেললে কেমন হয়?"

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, "খুব ভাল হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।"

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "কিসের ভাল হয়? কিছুতেই ভাল হবে না মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।"

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলশকর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রথ।

বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তীর ছুঁড়লেন না। দুপুরে বন-ভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, "বাপ রে! ভীষণ ভূত!"

মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, "তাই বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনাচ্ছি, রাজ্যে যত ভূত আছে ধরে ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।"

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, "ভূত। না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনো মাথা ধরে?"

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, "মাথা ধরলেও বদ্যি-ভূত আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।"

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড় খারাপ।"

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দর মহলের অলিন্দে রানীর পাশাপাশি বসে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, "চলো রানী, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।"

রানী তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়া-তাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, "তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তা-ভাতের জোগাড় কর।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "পান্তাভাত? পান্তাভাতটা কী জিনিস বলো তো?"

"জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।"

"বলেছি! তা হবে। কখন যে কী বলি। মনটা ভাল নেই তো, তাই।"

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, "ওরে তোরা আজ থেকে পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।"

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, "রাজামশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।"

আর একজন বলল, "রাজামশাই একা একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুঁতখুঁত করে কাঁদছেন।"

আর একজন এসে খবর দিল, "রাজা মশাই এক দাসীর বাচ্চা ছেলের হাত থেকে একটা মণ্ডা কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন এই মাত্র।"

চতুর্থ জন বলল, "আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন আর বলছেন সবই তো হল, আর কেন?"

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, "ঠিক আছে, নজর রেখে যা।"

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, "আজ্ঞে, রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস? রাখ' বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।"

দ্বিতীয় জন এসে বলে, "আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'কানে কেন্নো ঢুকবে,বেরিয়ে আয়'।"

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক-লাজুক ভাব করে বলল, "আজ্ঞে আমি বিকেলে রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালী সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, 'ওরে, ভাল গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই।' বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।"

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনও এসে পৌঁছয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন।

ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলা-কৌশল করতে যায়নি। সকালবেলা রাজার শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি। আপনার ওপর নজর রাখছি।"

রাজা অবাক হলেও স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, ''বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।''

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, ''চিমটি দে। রাম চিমটি দে।''

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি রাজার পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, "করিস কী, করিস কী? ওরে বাবা!''

রাখহরি বলল, ''বললেন যে।''

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ল্যাঙ মেরে ফেলে দে।'' বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাঙ মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, "হুঁ।"

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনও ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু-পিছু শোওয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁত-খুঁত করে বলে উঠলেন, ''ঠান্ডা জলে চান করব. ঠান্ডা জলে..." রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেসে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, ''আচ্ছা শুগে যা।''

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, ''দে বুকে ছোরা বসিয়ে দে...'' চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা বললেন, ''থাক থাক, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।''

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, "ওরে, আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে।"

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ''বাব বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।"

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, ''ওঃ হোঃ হোঃ। কী আনন্দ! কী আনন্দ।''

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল আবার। কারণ নেই কিছু নেই রাজা সব সময়ে কেবল ফিক-ফিক করে হেসে ফেলছেন। খুব দুঃসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক-ফিক। অমুক মারা গেছে? ফিক-ফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক-ফিক। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক-ফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।




আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে মিত্র ও ঘোষ-এর উপহার
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র
প্রথম খণ্ড। প্রকাশিত হয়েছে।
মূল্য-১৫৲
।। দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুতির পথে ।।
প্রতি খণ্ড আনুমানিক ৫০০ শত পৃষ্ঠা ডবল ডিমাই সাইজে প্ল্যাসটিক জ্যাকেটে মোড়া, সিল্ক স্ক্রীনে ছাপা, সুদৃশ্য প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছে
সকল গ্রন্থের মূল সংস্করণের প্রায় সব ছবিই এই বিশেষ সংস্করণে আছে।
দুই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসকল
ঠাকুরমা'র ঝুলি, চিরদিনের রূপকথা, ঠানদিদির থলে, বাংলার সোনার ছেলে, সবুজ লেখা, আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী, ভাদ্র, চারু ও হারু, ফার্স্ট বয়, লাস্ট বয়, উৎপল ও রবি, ঠাকুরদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, আমার দেশ, পূজার কথা।
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, -৭৩



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রার মধ্যরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে পুলিসের-হাতে-আটক বেহুঁশ ছেলেটিকেই জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে হাসপাতাল-পালানো স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। চান্দোলির সূর্যনারায়ণ জয়রামবাবুর পুরনো বন্ধু ; ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। চন্দ্রভানুও হারানো-জ্যোতির খোঁজে জয়রামবাবুর বাড়ির উপরে নজর রাখছেন। তারপর—

॥ ১২ ॥

ক্রমে সন্ধে হয়ে এল। রাস্তার বাতিগুলো এক সময়ে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরের আলোও জ্বলে উঠল। চন্দ্রভানুবাবু একটু সরে দাঁড়ালেন। অত বড় ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর তাহলে বোধহয় ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এসেছে। হয়তো মাথায় চোট লেগেছিল, সেই জন্যেই মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাস্তা দিয়ে অসংখ্য লোক চলাচল করছে। তিনি যে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জয়রামবাবুর ঘরের ভেতরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তা নিশ্চয়ই কেউ লক্ষ করছে না। লক্ষ করলে তাঁকে সন্দেহ করত। তবু তিনি খুব সাবধানে সব কিছু দেখছিলেন।

খানিক পরে অন্ধকার আরও গাঢ় হল। এক সময়ে মাস্টারমশাই পড়ানো শেষ করে চলে গেলেন। জয়রামবাবু সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। আর কিছু দেখা গেল না।

চন্দ্রভানুবাবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপর যখন আর কিছুই দেখা গেল না, তখন বোঝা গেল সবাই ভেতরে চলে গেছে। তিনি একটা ট্যাক্সি ধরে আবার নিজের হোটেলে ফিরে এলেন। হোটেলে নিজের ঘরে গিয়ে রাত্রের খাবারটা খেয়ে নিলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবলেন এত সহজে তাঁকে হার মানলে চলবে না। নিজের ভাইয়ের কাছে কেন হারবেন তিনি! ছোট-বেলায় তিনি বড় ভাইয়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন বলেই তো এতদিন লড়াই করে এসেছেন। লড়াই করে আজ সব বিষয়েই জিতেছেন। দাদার টাকার চেয়ে আজ তাঁর টাকা বেশি, সম্পত্তি বেশি। বাবা তাঁকে কিছুই দিয়ে যাননি। সবই তিনি নিজের ক্ষমতায় উপার্জন করেছেন। আর তাঁর দাদা? দাদাই ছিল তাঁর বাবার প্রিয়। দাদাকেই তিনি তাঁর চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। যারা একদিন বলেছিল,—'চন্দ্রভানুটা গোল্লায় যাবে আর জয়রাম বংশকে উজ্জ্বল করবে' তারা আজ বেঁচে থাকলে দেখতে পেত যে, তাদের কথা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি। জয়রাম শুধু বাবার দেওয়া টাকা ব্যাঙ্কে রেখে তার সুদে সংসার চালাচ্ছে আর উলটো দিকে চন্দ্রভানু নিজের পরিশ্রমের টাকায় দাদার চেয়েও বড়লোক হতে পেরেছে।

শুধু একটা ব্যাপারে দাদা তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন। সেটা হল এই যে, দাদার একটা ছেলে আছে, আর তাঁর কিছুই নেই। তাঁর কপালে গৃহ-সুখ নেই।

ভাবতে ভাবতে তিনি আরও অতীতে চলে গেলেন। প্রথম জীবনে দাদা কি বাবা কি স্কুল-মাস্টারদের কাছ থেকে তিনি কেবল অপমান আর অপযশই পেয়েছেন, এখন তিনি তারই প্রতিশোধ নেবেন। দাদার ছেলেটাকে চুরি করে এবার বাকি অভাবটুকুও পূরণ করে নেবেন তিনি। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তিনি সেবার ব্যর্থ হলেন। মাঝপথে হঠাৎ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অনেক ভাগ্য ভাল যে তিনি বেঁচে আছেন আর জ্যোতিষ্কও সেরে উঠে তার বাবার কাছে ফিরে এসেছে।

পরের দিন সন্ধেবেলা আবার তিনি জয়রামবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবার সেই একই দৃশ্য। জ্যোতিষ্কর সামনে বসে বসে একজন মাস্টারমশাই পড়াচ্ছে। আর পাশের একটা ঘরে কয়েক-

জন বয়স্ক লোকের সঙ্গে বসে বসে দাদা গল্প করছে। অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোকরা চলে গেলেন। তখন দাদা এ-পাশের ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লেখাপড়া করছে জ্যোতি?"

মাস্টারমশাই বললেন, "আগের থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে।''

দাদা বললেন, ''ভাল তো হবেই, ডাক্তার তো ভাল ভাল ওষুধ দিচ্ছে। ডাক্তারও বলছে, আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে ওর।''

চন্দ্রভানুবাবু বাইরে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন।

মাস্টারমশাই বললেন, ''এবার ওকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিন না।"

দাদা বললেন, ''না মাস্টার, এবার অনেক কষ্টে ওকে ফিরে পাওয়া গেছে, আবার যদি কেউ ওকে চুরি করে নিয়ে পালায় ?''

জ্যোতি বললে, "আমাকে চুরি করবে কী করে—''

দাদা বললেন, ''তুমি যেমন বোকা, সেবারে তোমাকে কে একজন তার সঙ্গে চলে যেতে বললে আর তুমিও অমনি তার সঙ্গে চলে গেলে। এবার যেন আবার কেউ যেতে বললেও তার সঙ্গে যেও না, বুঝলে ?''

চন্দ্রভানুবাবুর কানে গেল কথাগুলো।

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, ''আমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কী করবে চোরটা ?''

দাদা বললেন, ''একবার তোমাকে দিয়ে যা করিয়েছিল তাই করবে। তোমাকে আফিম কি কোকেন খাইয়ে দেবে। তখন আবার তুমি অসুখে পড়বে।''

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, ''আফিম ? কোকেন ? ও-সব কী জিনিস ?"

দাদা বললেন, "শুনেছ মাস্টার, আমি যত ওকে বাইরে যেতে মানা করি, যত বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করি, তত আমার সঙ্গে তর্ক করবে।''

মাস্টারমশাই বললেন, "ছিঃ, বাবার সঙ্গে কি তর্ক করতে আছে ? বাবা যা বলছেন, তোমার ভালর জন্যেই বলছেন। বাবা হলেন গুরুজন, বাবার কথা শুনতে হয়।"

জ্যোতি বললে, "আমি তো বাবার কথা শুনি। আমি কি আর রাস্তায় বেরোই —"

"না, এখন বেরোবে না। যখন তোমার আরও বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে তখন বেরোবে। রাস্তায় বেরোলে আবার তোমাকে ছেলে-ধরা ধরে নিয়ে যাবে। ধরে নিয়ে গিয়ে আবার তোমাকে দিয়ে রাস্তায় বসিয়ে ভিক্ষে করাবে।"

এবার যেন কথাটা শুনে জ্যোতি একটু ভয় পেয়ে গেল।

খানিক পরে মাস্টারমশাই পড়ানো শেষ করে চলে গেলেন। ভেতর থেকে একজন চাকর এসে বললে, "বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

দাদা বললে, "চলো, খেতে চলো।"

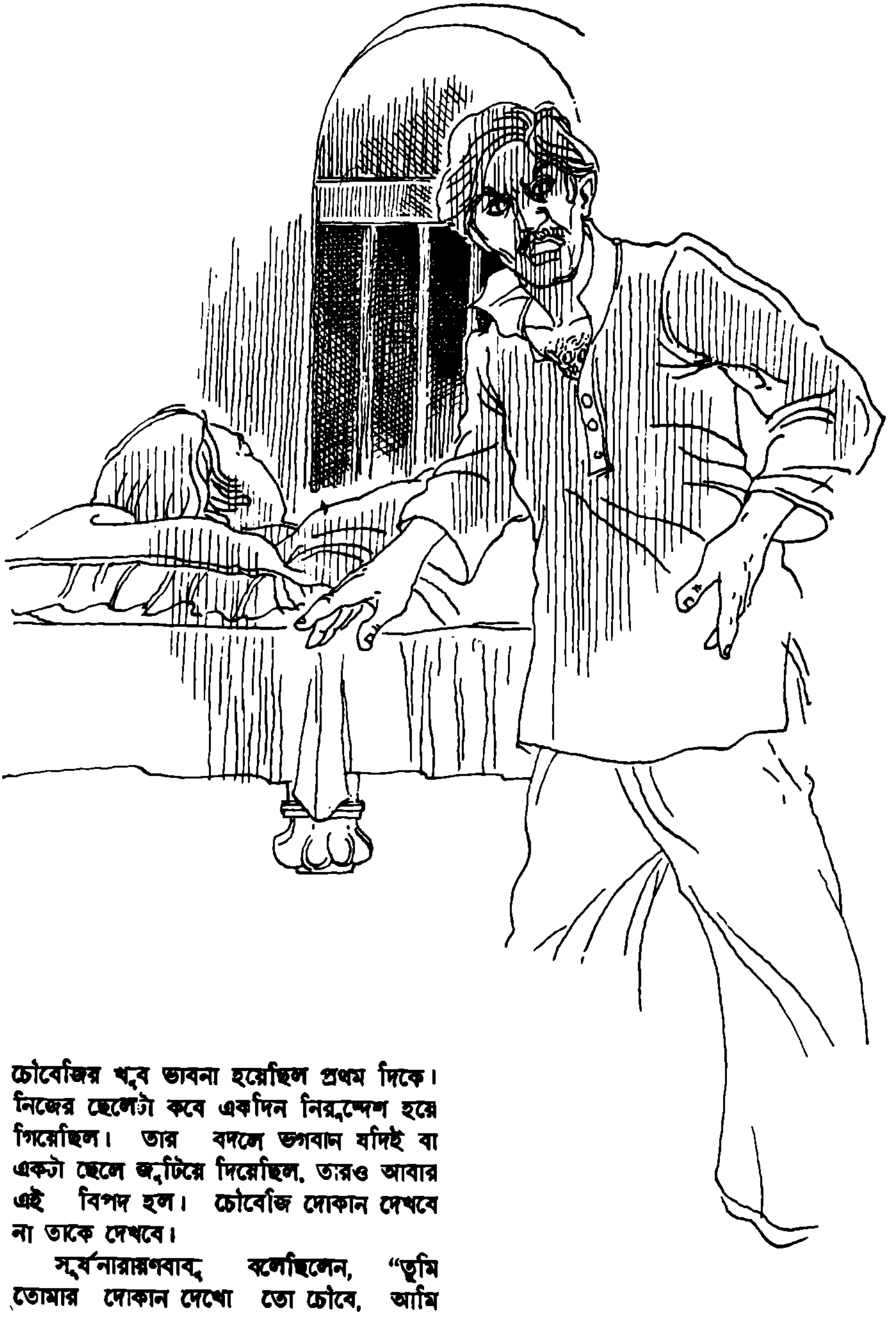
জ্যোতি উঠল। দাদা দরজায় খিল বন্ধ করে দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর আর কিছু দেখা গেল না।

চন্দ্রভানুবাবু এবার আগের দিনের মতো আবার একটি ট্যাক্সি ধরে নিজের হোটেলে ফিরে গেলেন, ভাবলেন, না অত সহজে হাল ছাড়লে চলবে না। যে-কোনও প্রকারে হোক জ্যোতিকে আবার চুরি করে নিয়ে যেতেই হবে। সেদিনও হোটেলে খেয়েদেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসতে চাইল না। তিনি হতাশ হলেন না। দাদাকেও হারাতে হবে। যে-দাদা একদিন তাঁকে অবহেলা করেছে, যে-দাদা একদিন ছোট ভাইকে মানুষ বলেই মনে করেনি, তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আস্তে আস্তে তাঁর চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। জ্যোতির কথাগুলো তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল, "আমি তো বাবার কথাই শুনি, আমি কি রাস্তায় বেরোই ?"

জ্যোতি যদি রাস্তাতেই না বেরোয় তাহলে তিনি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মতি-হারিতে নিয়ে যাবেন কী করে ? তাহলে দাদার ওপর প্রতিশোধ নেবেন কী করে ?

ভাবতে ভাবতে হোটেলের ঘরের বিছানার ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তার আর খেয়াল রইল না।

চান্দোলির একটা হাসপাতালে অনেকদিন পরে যেন একটু জ্ঞান ফিরল খোকার। চৌবেজি রোজই একবার করে আসত। লোকটা ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল তার গলায়। প্রায় মারা যাওয়ার অবস্থা হয়ে উঠেছিল।



চৌবেজির খুব ভাবনা হয়েছিল প্রথম দিকে। নিজের ছেলেটা কবে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। তার বদলে ভগবান যদিই বা একটা ছেলে জুটিয়ে দিয়েছিল, তারও আবার এই বিপদ হল। চৌবেজি দোকান দেখবে না তাকে দেখবে।

সূর্যনারায়ণবাবু বলেছিলেন, "তুমি তোমার দোকান দেখো তো চৌবে, আমি তোমার ছেলেকে দেখব। ও তো আমার জন্যেই এই বিপদে পড়ল।"

তা সত্যি! ওই চৌবের ছেলেটা যদি

না দেখত তাহলে তো তাঁর অতগুলো টাকা মারাই যেত। প্রথম দিন থেকেই ছেলেটার ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কার ছেলে, কে তার বাপ-মা, কোথায় ছেলেটার বাড়ি, কারও কিছুই জানা ছিল না। যখনই সূর্যনারায়ণবাবু দেবরাজের দোকানে আসতেন, তিনি তাকে লজেন্স কিনে খেতে দিতেন। ছেলেটা নিতে চাইত না। বলত, "আপনার জিনিস আমি নেব কেন ?"

সূর্যনারায়ণবাবু বলতেন, "আমি তোমাকে দিচ্ছি, নাও—"

ছেলেটা তবু নিত না। চৌবেজির দিকে চেয়ে দেখত। চৌবেজি বলত, "নাও নাও, বড়বাবু আদর করে তোমাকে খেতে দিচ্ছেন, নিতে কোন দোষ নেই। তুমি নাও।"

কোনও দিন লজেন্স, কোনও দিন চকোলেট। চৌবেজির দোকানে যা-কিছু খাবার জিনিস কিনতে পাওয়া যেত, সূর্যনারায়ণবাবু নিজের পয়সায় তাই-ই কিনে ছেলেটাকে খেতে দিতেন। যাওয়ার সময় বলতেন, "বড় ভাল ছেলেটা তোমার। ভগবান তোমাকে পাইয়ে দিয়েছে ওকে, ওকে একটু যত্ন কোরো তুমি।"

চৌবেজি বলত, "সবই আপনার আশীর্বাদ বড়বাবু।"

এক-একদিন অন্য দোকান থেকেও কিছু খাবার কিনে এনে খেতে দিতেন। কারণ তিনি জানতেন চৌবেজি গরিব মানুষ, ছেলেটাকে ভাল-মন্দ খাওয়াবার মতো পয়সা নেই তার। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান সেরে চৌবেজির দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরবার সময় চৌবেজি যেমন বড়বাবুকে প্রণাম করত, ছেলেটাও তেমনি দেখাদেখি প্রণাম করত।

এমনি করে কেমন যেন সূর্যনারায়ণবাবুর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তার ওপর।

সূর্যনারায়ণবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী নাম রেখেছ ওর ?"

চৌবেজি বলেছিল, "ও তো ওর নিজের নাম জানে না বড়বাবু। আমার নিজের ছেলের নাম তো রেখেছিলাম ভূষণ।"

"কিন্তু তুমি নিজেই তো ওর একটা নাম রেখে দিতে পারো।"

"আপনিই বলে দিন না, এর কী নাম আমি রাখব ?"

বড়বাবু বলেছিলেন, "ওর নাম রাখো দেবদত্ত। দেবতাই তো ও'কে তোমায় দিয়েছে, তাই ওর নাম দাও দেবদত্ত।"

তা সেই থেকে ছেলেটার নাম হয়ে গেল দেবদত্ত। হাসপাতালে যখন অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় ভর্তি করে দেওয়া হল তখন ওই দেবদত্ত নামেই ভর্তি করা হল। হাসপাতালে সকালে-বিকালে দুবার করে তিনি দেবদত্তকে দেখতে যেতেন। যাবার সময় সঙ্গে অনেক রকম খাবার নিয়ে যেতেন। কখনও দুধ, কখনও ফল, কখনও মিঠাই।

চৌবেজি বলত, "আপনি ওর জন্যে এত খরচ করছেন বড়বাবু।"

বড়বাবু বলতেন, "তা আমি খরচ করব না তো কি তুমি খরচ করবে ? তোমার অত টাকা কোথায় ? ওর জন্যেই তো আমার এতগুলো টাকা বেঁচে গেল। ও তো বলতে গেলে আমার জন্যেই নিজের প্রাণটি দিতে যাচ্ছিল। আর একটু হলেই তো ও মারা যেত। নেহাত ভগবানের অনেক দয়া তাই এ-যাত্রা বেঁচে গেল।"

চৌবেজির চোখে জল আসত কথাগুলো শুনে। বলত, "ও আমার কেউ নয় বড়বাবু। মনে করুন ও আপনারই ছেলে।"

বড়বাবু বলতেন, "এখন এই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে আমি ওকে তোমার কাছে পাঠাব না। ওর এখন একটু দুধ-ঘি-ফল-টল খাওয়া দরকার। ওকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলব। সে-কথা আমি এখন থেকে তোমায় বলে রাখছি।"

চৌবেজি বলত, "তা আপনি আপনার বাড়িতে নিয়ে যান না। ও আপনারই ছেলে।"

যেদিন হাসপাতাল থেকে ডাক্তার দেবদত্তকে ছেড়ে দিলে সেদিন বড়বাবু বললেন, "কী গো চৌবে, আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই ? তুমি কিছু মনে করবে না তো ?"

দেবরাজ বললে, "তা নিয়ে যান না। আমি তো আপনাকে বলেই রেখেছি।"

"হ্যাঁ, শেষকালে কান্নাকাটি করতে পারবে না তুমি। তুমি দেখে নিও, আমি ওকে দুধ-ক্ষীর-দই খাইয়ে কেমন মোটা-সোটা করে দিই।

যখনই তোমার ইচ্ছে হবে তুমি আমার বাড়িতে এসে দেখে যেও। বুঝলে ?"

দেবরাজের সামনেই সাইকেল-রিকশা করে বড়বাবু দেবদত্তকে নিজের বাড়ির দিকে নিয়ে চলে গেলেন।

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করলে, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বড়বাবু ? আপনার বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ, তোমার কোনও কষ্ট হবে না। তুমি যা খেতে চাইবে আমি তোমাকে তাই-ই খেতে দেব।"

সাইকেল-রিকশাটা যখন দেবদত্তকে নিয়ে চলে গেল চোবেজি সেই দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে টপ-টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর যখন রিকশাটা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন সে আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির দিকের রাস্তাটা ধরল।

কলকাতায় তখন অনেক রাত। সমস্ত শহর ঘুমিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। জয়রামবাবুর বাড়ির দেওয়াল বেয়ে উঠে একজন বীভৎস চেহারার লোক তাঁর শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মারলে। মুখখানার চেহারা দেখলেই ভয়ে গা শিউরে ওঠে। লোকটা ভেতরে চেয়ে দেখতে পেলে একটা খাটে জয়রামবাবু শুয়ে আছে আর অন্য একটা খাটে সেই জ্যোতি। ঘরের আলো নেভানো কিন্তু রাস্তার ইলেকট্রিক আলোয় ঝাপসা-ঝাপসা আলো-অন্ধকারে দুজনকে দেখা গেল। ঘরের দরজাটা খোলা। লোকটা দরজার পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুললে, তারপর জ্যোতির বিছানার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। আর তারপর জামার পকেট থেকে একটা রুমাল বার করল। তারপর সেই রুমালটা জ্যোতির নাকের কাছে রাখলে। প্রথমটায় জ্যোতি একটু নড়া-চড়া করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল। লোকটা যখন বুঝতে পারলে যে জ্যোতির আর জ্ঞান নেই তখন তাকে পাঁজাকোলা করে দুই হাতে বুকের ওপর তুলে নিলে। নিয়ে টিপি-টিপি পায়ে আবার দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। তখনও জ্যোতি অজ্ঞান-অচৈতন্য...।

(ক্রমশ)

ছবি অরূপ রায়



টাট্টুলাল

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

ছোট্টুলালের কাঠের ঘোড়া,
নাম হল তার টাট্টুলাল!
তার পিঠেতে চাপলে পরে
ঠুকতে থাকে পায়ের-নাল!
তারপরে সে এগিয়ে চলে
খটখটিয়ে পেরিয়ে খাল,
হাট পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে,
সামলে নিয়ে দুলকি-চাল!
ছোট্টুলালের চাবুক খেয়ে
যায় সে ছুটে অচিনদেশ,
কান উঁচিয়ে, খটখটিয়ে—
তেপান্তরের মাঠের শেষ!
তারপরে সে আসে ফিরে,
পেরিয়ে নদী, পেরিয়ে খাল!
পিঠের পরে থাকেন বসে
ছোট্ট মনিব 'ছোট্টুলাল'!

ছবি দেবাশিস দেব

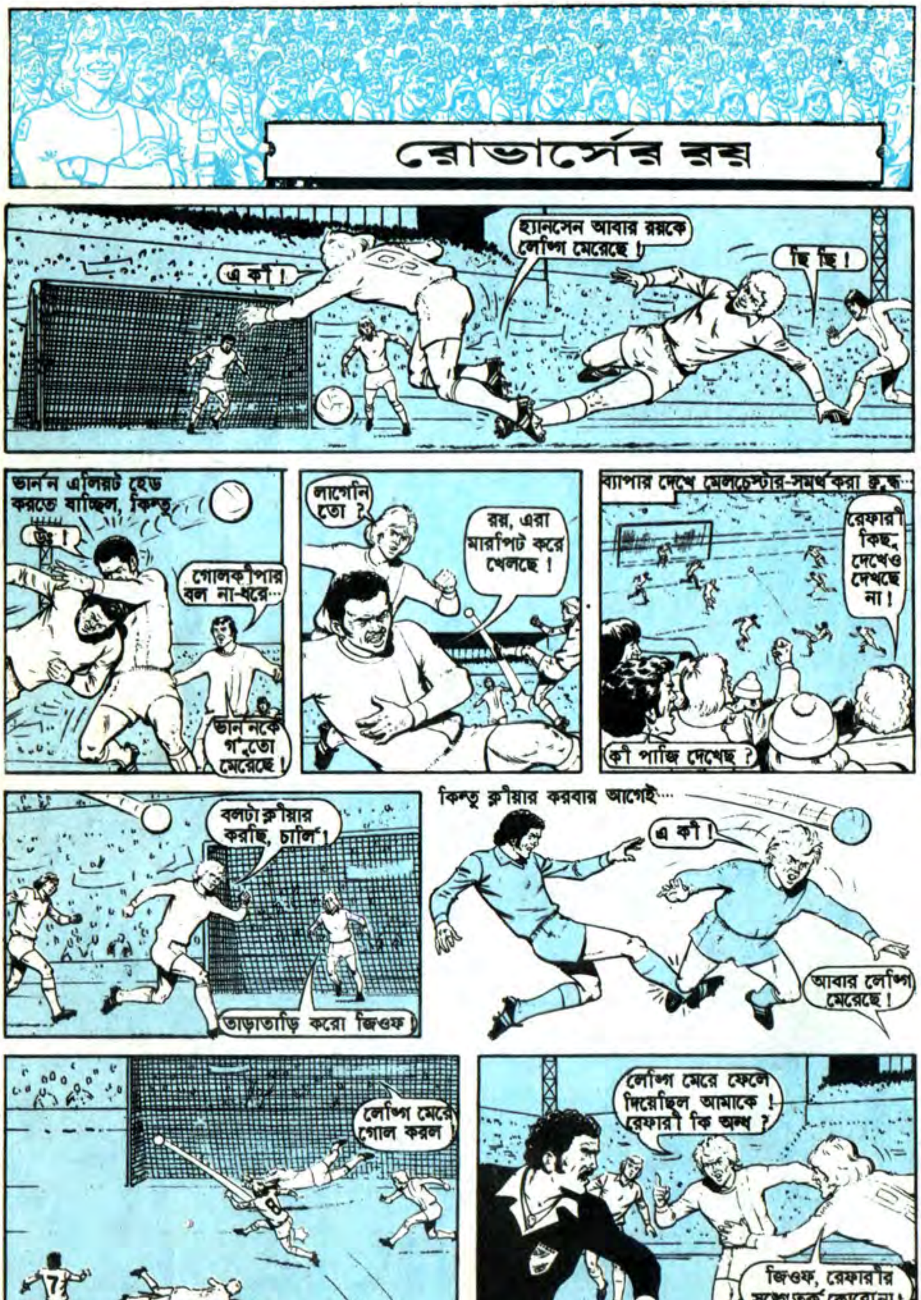
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** আদিকাণ্ড

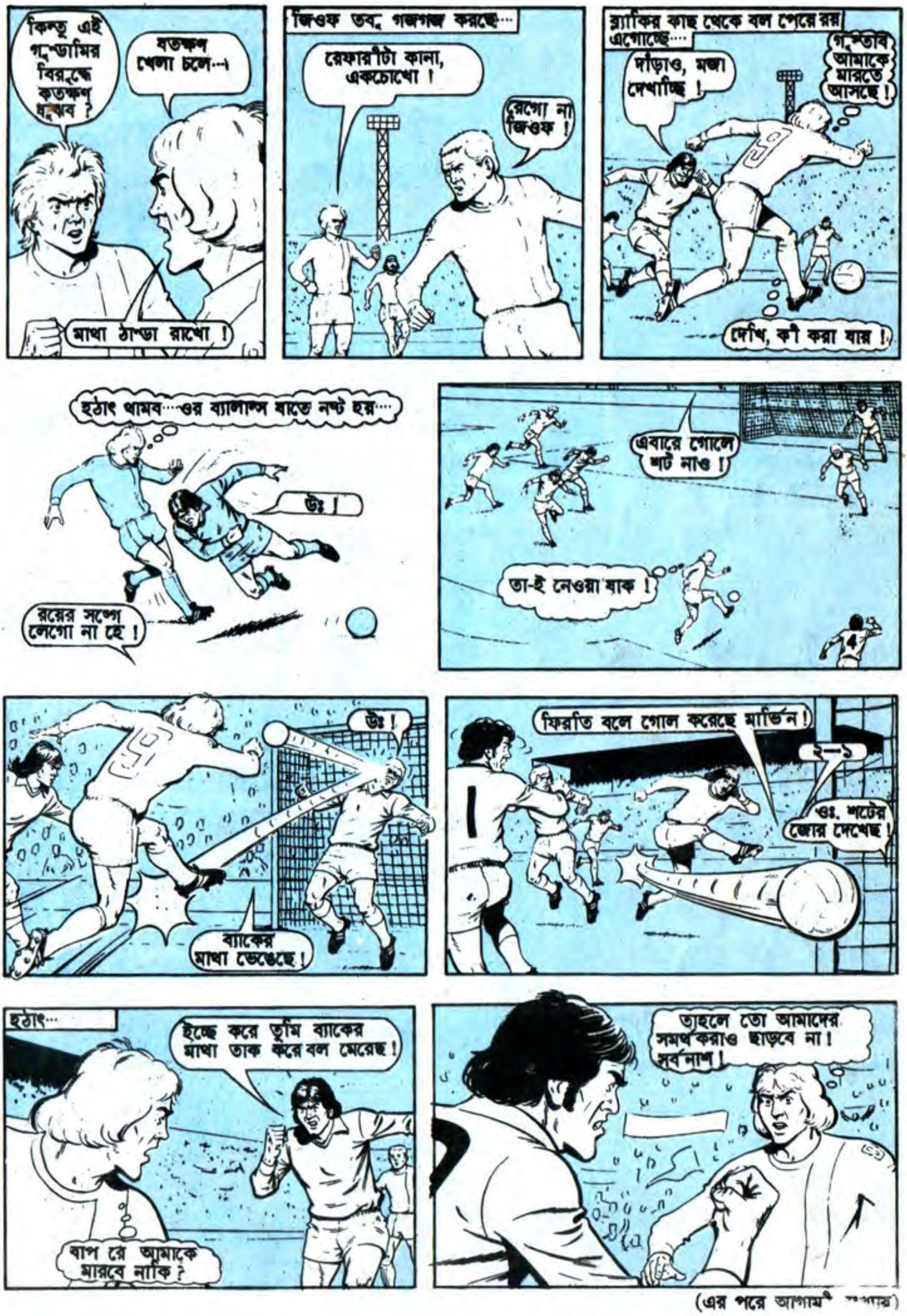
চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ



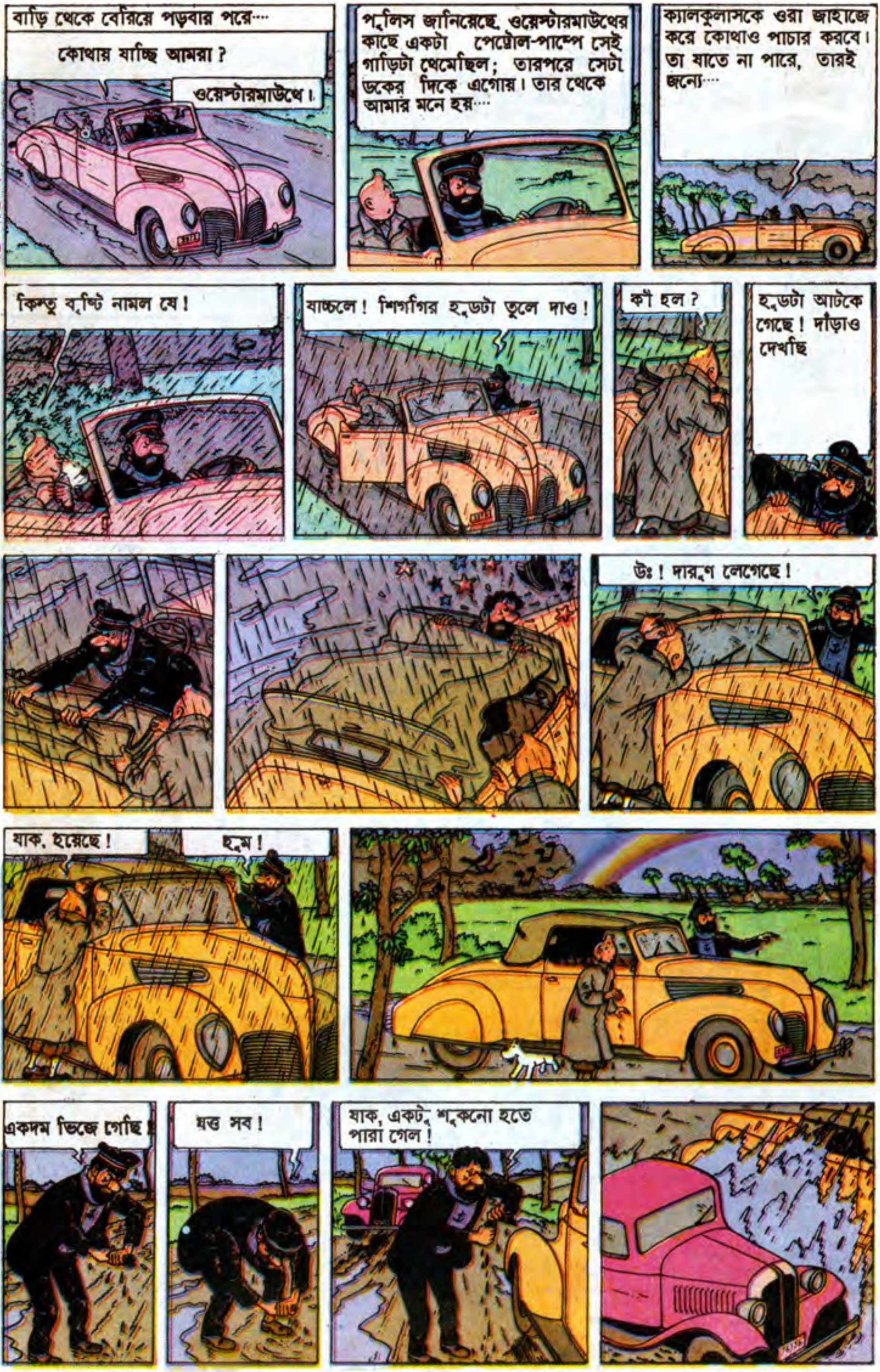


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রোভার্সের রয়
এ কী!
হ্যানসেন আবার রয়কে লেঙ্গি মেরেছে!
ছি ছি!
ভার্নন এলিয়ট হেড করতে যাচ্ছিল, কিন্তু
উঃ!
গোলকীপার বল না-ধরে...
ভার্ননকে গুঁতো মেরেছে!
লাগেনি তো?
রয়, এরা মারপিট করে খেলছে!
ব্যাপার দেখে মেলচেস্টার-সমর্থকরা ক্রুদ্ধ...
রেফারী কিছু দেখেও দেখছে না!
কী পাজি দেখেছ?
বলটা ক্লীয়ার করছি, চার্লি!
তাড়াতাড়ি করো জিওফ!
কিন্তু ক্লীয়ার করবার আগেই...
এ কী!
আবার লেঙ্গি মেরেছে!
লেঙ্গি মেরে গোল করল
লেঙ্গি মেরে ফেলে দিয়েছিল আমাকে! রেফারী কি অন্ধ?
জিওফ, রেফারীর সঙ্গে তর্ক কোরোনা!



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার পরে····
কোথায় যাচ্ছি আমরা ?
ওয়েস্টারমাউথে।
পুলিস জানিয়েছে, ওয়েস্টারমাউথের কাছে একটা পেট্রোল-পাম্পে সেই গাড়িটা থেমেছিল; তারপরে সেটা ডকের দিকে এগোয়। তার থেকে আমার মনে হয়····
ক্যালকুলাসকে ওরা জাহাজে করে কোথাও পাচার করবে। তা যাতে না পারে, তারই জন্যে····
কিন্তু বৃষ্টি নামল যে !
যাচ্চলে ! শিগগির হুডটা তুলে দাও !
কী হল ?
হুডটা আটকে গেছে ! দাঁড়াও দেখছি
উঃ ! দারুণ লেগেছে !
যাক, হয়েছে !
হুম !
একদম ভিজে গেছি !
যত্ত সব !
যাক, একটু শুকনো হতে পারা গেল !



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবু আর সন্তু এবারে গেছে হিমালয়ে মাউন্ট এভারেস্টের দিকে এক অভিযানে। কালাপাথর নামে একটা পাহাড়ের কাছে ইয়েতির মতন একটা কোনো জানোয়ার দেখে মালবাহক আর শেরপারা ভয়ে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু আর সন্তু আশ্রয় নেয় একটা পুরনো কালের গম্বুজের মধ্যে। কে বা কারা যেন সেই গম্বুজের দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায় বাইরে থেকে। কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর পাঠালে হেলিকপটারে করে দুজন মিলিটারি অফিসার এসে ও'দের উদ্ধার করেন। তারপর তাঁরা সবাই মিলে ইয়েতির সন্ধানে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে কাকাবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বরফের ওপর পড়ে আছে খানিকটা রক্ত আর কাকাবাবুর একটা ক্রাচ। তারপর—]

॥ ১৫ ॥

জ্ঞান ফেরার পর কাকাবাবু চোখ মেলে দেখলেন পাতলা-পাতলা অন্ধকার। তিনি ভাবলেন বুঝি রাত হয়ে গেছে। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছেন, তা তো তিনি জানেন না।

পাশে হাত দিয়ে দেখলেন, বরফ নয়, তিনি শুয়ে আছেন পাথরের ওপর। এখানে তিনি কী করে এলেন? তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওরা তাঁকে ধরাধরি করে এনে এই পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়েছে? সন্তু কোথায়? রানা আর ভার্মাই বা কোথায় গেল?

কাকাবাবু ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

তারপরই তাঁর মনে পড়ল, তিনি তো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাননি, কেউ তাঁর মাথায় খুব শক্ত কোনো জিনিস দিয়ে মেরেছিল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, মাথায় চটচট করছে রক্ত। বেশ ব্যথাও আছে।

তা হলে সত্যিই কেউ তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু উঠে বসলেন। তাঁর হাত-পা তো বাঁধেনি কেউ। কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন এবং খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রিভলভারটাও আছে!

কাকাবাবু চোখে অন্ধকারটা সইয়ে নিলেন। ওপর দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পেলেন না। মনে হল, একটা কোনো মস্ত বড় গুহার মধ্যে তিনি আছেন। বাঁ দিকে অনেক দূরে খানিকটা ধোঁয়া-ধোঁয়া মতন অস্পষ্ট আলো ভেসে বেড়াচ্ছে, সে-আলোটা কিসের তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

এপাশ - ওপাশ হাতড়েও তিনি ক্রাচ দুটো খুঁজে পেলেন না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্রাচ দুটো না থাকলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন, ইচ্ছেমতন চলাফেরা করতে পারেন না। তিনি আবার ভাবলেন, যে বা যারাই তাঁকে ধরে আনুক, রিভলভারটা নিয়ে নেয়নি কেন?

বেশ দূরে তিনি মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কান খাড়া করে তিনি কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, কে যেন মাইক্রোফোনে কিছু বলছে। কথার শেষে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে একটা। সব ব্যাপারটা তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হল। হিমালয়ে এই বরফের রাজ্যে মাইক্রোফোন?

তিনি মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝতে চাইলেন যে, তিনি এখনো ঘুমিয়ে আছেন কি না। অমনি মাথার যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে গেল। তিনি এমনই অবশ হয়ে পড়লেন যে, আবার শুয়ে পড়তে হল তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। খানিকটা সুস্থ হবার পর তিনি রিভলভারটা বার করে পাশে নামিয়ে রেখে ওভারকোটের অন্য পকেটগুলো খুঁজতে লাগলেন। তাঁর কাছে নানারকম ওষুধ থাকে। কয়েকটা ট্যাবলেট পেয়ে গেলেন তিনি। অন্ধকারেই টিপে-টিপে বুঝে একটা ট্যাবলেট বেছে নিলেন। এটা ব্যথা কমাবার ওষুধ। কিন্তু ট্যাবলেট গিলতে গেলে জল লাগে, এখানে জল পাবার কোনো উপায় নেই। ওষুধটা খুব তেতো, তবু চুষে চুষে সেটাকে খেয়ে ফেললেন কাকাবাবু।

তারপর গলা থেকে স্কার্ফটা খুলে মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধলেন। বেশিক্ষণ রক্ত পড়লে তিনি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বেন।



এ-জায়গাটায় শীত বেশ কম। হাতের গ্লাভস খুলে ফেলার পরেও আঙুল কনকন করে না। নাকের ডগায় আড়ষ্ট ভাব নেই। এটা তা হলে মাটির নীচের কোনো গুহা। কোনো জায়গা থেকে নিশ্চয়ই হাওয়া আসে, কারণ নিশ্বাস নিতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

হঠাৎ কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন। কী যেন একটা জিনিস ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর পিঠের ওপর।

তিনি মুখ ফিরিয়ে দু'হাতে জিনিসটাকে এক ঝটকা মারলেন। অমনি সেটা মাটির ওপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। একটা সাদা রঙের কুকুর!

কুকুরটা হিংস্রভাবে ডেকে আবার তেড়ে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু তাঁর সুস্থ পা দিয়ে সেটাকে এক লাথি মারলেন খুব জোরে। খানিকটা দূরে ছিটকে গেল কুকুরটা, আবার এসে ঘ্যাঁক করে তাঁর পা কামড়ে ধরল। কাকাবাবু জোর করে সেটাকে ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি খুব মোটা প্যান্ট পরে আছেন বলে কুকুরটা দাঁত বসাতে পারেনি।

কুকুরটা মাথা নিচু করে, পেছনের একটা পা আছড়াতে আছড়াতে রাগে গজরাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাকাবাবু রিভলভারটা তুললেন। এক গুলিতেই কুকুরটাকে তিনি সাবাড় করে দিতে পারেন। কিন্তু কাকাবাবু কুকুর ভালবাসেন। কুকুরটাকে তাঁর মারতে ইচ্ছে হল না।

কুকুরটা জার্মান স্পিৎস জাতের, বেশি বড় নয়। এই জাতের এক-একটা কুকুর খুব হিংস্র হয় বটে, কিন্তু এর কামড়ে তো মানুষ মরে না!

তিনি কুকুরটাকে শান্ত করার জন্য চুঃ চুঃ শব্দ করতে লাগলেন। তবু কুকুরটা আর একবার লাফিয়ে তাকে কামড়াতে এল। কাকাবাবু আগে থেকেই রেডি ছিলেন, সজোরে কষালেন এক লাথি।

কুকুরটা এবার ডাকতে-ডাকতে কাকাবাবুর পেছন দিকে চলে এল। কাকাবাবুও ঘুরে বসলেন সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা তো জ্বালাবে খুব। অথচ এমন সুন্দর একটা কুকুরকে মেরে ফেলারও কোনো মানে হয় না! কয়েকবার লাথি খেয়ে কুকুরটাও আর সহজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, একটা কোনো সুযোগ খুঁজছে।

হাতের কাছে কিছু না পেয়ে কাকাবাবু কুকুরটার দিকে একটা গ্লাভস ছুঁড়ে মারলেন। কুকুরটা অমনি সেটা কামড়ে ধরে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। তারপর হঠাৎই সেটা মুখে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল দূরে।

একটু বাদেই সেটা আবার ফিরে এল। তার মুখটা খালি। কাকাবাবু ভাবলেন, এই রে, গ্লাভসটা নষ্ট হয়ে গেল! কোথায় রেখে এল সেটাকে? যাই হোক, একটা যখন গেছে, তখন আর একটা রেখেই বা কী হবে! কাকাবাবু সেটাও ছুঁড়ে মারলেন কুকুরটার দিকে। সে সেটাকে মুখে নিয়ে খুব জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল যেন বেশ একটা মজার



খেলা পেয়েছে। আবার সে সেটা নিয়ে পালিয়ে গেল একই দিকে। আর ফিরে এল না।

কাকাবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন কুকুরটার জন্য। আর তার পাত্তা নেই। কাকাবাবু ভাবতে লাগলেন, একটা পোষা কুকুর এই গুহার মধ্যে কী করে এল? স্পিৎস কুকুর সাধারণত পোষাই হয়। হিমালয়ের এতখানি উচ্চতায় কোনো জন্তু-জানোয়ারই দেখা যায় না। চারদিকে বরফের রাজত্ব, এর মধ্যে একটা পোষা কুকুর। কিছুক্ষণ ভাবার পর কাকাবাবু আপন মনেই বললেন, হুঁঃ!

তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন দুপুরবেলার ঘটনা। কেউ একজন পেছন থেকে তাঁর মাথায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। তাহলে সন্তু আর অন্যদের কী হল? তাদেরও কি মেরে এই গুহার মধ্যে কোথাও ফেলে রেখেছে? রানা আর ভার্মার কাছে লাইট মেশিনগান ছিল, তাদের মারা অত সহজ নয়। কিন্তু তাঁকে যখন মারা হল, তখন ওরা কেউ বাধা দিল না কেন? ওরা কোথায়? বিশেষ করে সন্তুর জন্য তিনি খুব উতলা বোধ করলেন। এক্ষুনি ওদের খোঁজ করা দরকার।

তিনি আস্তে আস্তে উঠে পড়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। দেয়ালের গা'টা এবড়ো-খেবড়ো। সেটা ধরে-ধরে এগোলেন খানিকটা। দূরে যেখানে আলোর মতন ধোঁয়া ভাসছে, তিনি সেইদিকে যেতে চান। কুকুরটাও ঐদিকেই পালিয়েছে।

মাইক্রোফোনে কথা বলার মতন যে আওয়াজটা খানিক আগে শোনা গিয়েছিল, সেটা থেমে ছিল এতক্ষণ। এবার আবার সেই শব্দটা বেজে উঠল। কাকাবাবু মানে বোঝার চেষ্টা করলেন। অনেক দূর থেকে খুবই অস্পষ্ট আসছে শব্দটা, —তবু তিনি এবার একটু-একটু বুঝতে পারলেন। কোনো কথা কেউ বলছে না, শুধু কয়েকটা এলোমেলো সংখ্যা আর অক্ষর। এন সি ও থ্রি টু নাইন নাইন ফাইভ...আর জি টি ফোর ফাইভ জিরো জিরো জিরো...টি ও ওয়ান এইচ এইট এইট জিরো জিরো জিরো...

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলেন। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আওয়াজটা থেমে গেল, তারপর খানিকক্ষণ ঝনন ঝনন রেশ রইল। কাকাবাবুর কপাল কুঁচকে গেল। এইসব অক্ষর ও সংখ্যার মানে কী? কে কাকে বলছে? কিংবা এমনও হতে পারে, অন্য কিছু শব্দ আসছে, তিনি ভুল শুনছেন। কিসের শব্দ?

আর দু-এক পা এগোতে গিয়েই কাকাবাবু হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন কিছুতে হোঁচট খেয়ে। তাঁর মাথায় আবার গুঁতো লাগল এবং ব্যথাটাও বেড়ে গেল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন আর জ্ঞান হারালে চলবে না। তিনি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। দূরের আলোর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যই কাছের অন্ধকার এখন বেশি

অন্ধকার লাগছে।

একটু পরে ব্যথাটা একটু কমল, চোখেও খানিকটা দেখতে পেলেন। কিসে আঘাত লাগল সেটা বোঝবার জন্য হাত বুলোতে লাগলেন চার দিকে। একটা কিছুতে হাত লাগল। ভাল করে হাত দিয়ে দেখলেন, সেটা একটা লোহার বাক্স। তিনি বাক্সটা টেনে খোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা তালা-বন্ধ। অনেক টানাটানি করেও তিনি সেটা খুলতে পারলেন না। গুহার মধ্যে তালাবন্ধ লোহার বাক্স! কাকাবাবু বাক্সটার ওপর উঠে বসে আবার ভাবতে লাগলেন ব্যাপারটা। এই গুহাটা কোথায়?

কাকাবাবু বেশিক্ষণ ভাবনার সময় পেলেন না। দূরে কুকুরটার ডাক শোনা গেল আবার। কাকাবাবু দেখলেন, দূরে সেই আলোর ধোঁয়ার মধ্যে কুকুরটা লাফালাফি করছে। কুকুরটা আবার এসে জ্বালাতন করবে। কাকাবাবুর খুব ইচ্ছে হল কুকুরটাকে আদর করতে। কুকুরটা যদি এত দুষ্টুমি না করত তাহলে ওকে কাছে ডেকে আদর করা যেত।

কুকুরটা কিন্তু এদিকে এল না। দূরেই খানিকটা লাফালাফি করে মিশে গেল ডান পাশের অন্ধকারের মধ্যে। আলোর ধোঁয়াটা কোথা থেকে আসছে সেটা জানা দরকার। মনে হচ্ছে যেন ওখানে একটা গর্ত আছে। কারণ ধোঁয়াটা এখন আসছে নীচের দিক থেকে।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে যাবেন, সেই সময় কুকুরটা আলোর ধোঁয়ার মধ্যে ফিরে এল আবার। এবার সেদিকে তাকাতেই কাকাবাবুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। কুকুরটার পাশে একটা বিরাট ছায়ামূর্তি! মাত্র এক পলক দেখা গেল সেটাকে। তারপরই মিলিয়ে গেল আবার।

কাকাবাবু দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইলেন। মূর্তিটাকে দেখে মানুষ মনে হল না, বরং যেন বিশাল একটা বাঁদরের মতন। লেজ আছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু বাঁদরের মতন সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। কাকাবাবু বুঝলেন, এই রকম মূর্তিই সন্তু আর মিংমারা দেখেছে। এই তবে ইয়েতি? কাকাবাবু রিভলভারটা শক্ত করে ধরে রইলেন।

আবার কুকুরটা ডেকে উঠল, আবার

মূর্তিটাকে দেখা গেল, আবার মিলিয়ে গেল। এইরকম দু-তিনবার। কাকাবাবু বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কী হচ্ছে ওখানে।

এরপর সেই বিশাল বাঁদরের মতন মূর্তিটা আলোর ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়াল; আর মিলিয়ে গেল না। কুকুরটা ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকছে আর লাফাচ্ছে। কিন্তু কুকুরটা ঐ মূর্তিটাকে কামড়াবার চেষ্টা করছে না। এক সময় মূর্তিটা খপ করে দু'হাতে তুলে নিল কুকুরটাকে। কাকাবাবু ভাবলেন, এইবার ও বুঝি কুকুরটাকে মেরে ফেলবে। তিনি রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খুলে ওদিকে টিপ করলেন।

কিন্তু মূর্তিটা কুকুরটাকে মারল না, মাটিতে ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা ডাকতে-ডাকতে ছুটে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু লোহার বাক্সটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তিনি লাথি ছুঁড়তে পারবেন না, কুকুরটা যদি ঝাঁপিয়ে কামড়াতে আসে, তিনি দু'হাত দিয়ে আটকাবেন।

কুকুরটা খানিকটা এসেই আবার ফিরে গেল মূর্তিটার কাছে। সেখানে কয়েকবার ডেকে আবার এদিকে ফিরল। তখন মূর্তিটাও এক পা এক পা করে আসতে লাগল এদিকে। কাকাবাবু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

মূর্তিটা দুলে দুলে আস্তে আস্তে হাঁটে। সোজা এদিকেই আসছে। আলোর ধোঁয়াটা ওর পেছনে বলে কাকাবাবু ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

কুকুরটা কাকাবাবুর একেবারে সামনে এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কাকাবাবু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। আর লুকোবার কোনো উপায় নেই, প্রাণীটা আসছে তাঁরই দিকে। তাঁর থেকে পাঁচ-ছ' হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাকাবাবু রিভলভারটা সোজা তুলে ধরলেন প্রাণীটার বুকের দিকে। প্রাণীটা তাঁর চেয়েও লম্বা। কিন্তু যত বড় বাঁদরই হোক রিভলভারের এক গুলিতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবেই। প্রাণীটা এক দৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বিকট একটা আওয়াজ করল। অনেকটা যেন অট্টহাসির মতন। কাকাবাবু ওর চোখ থেকে চোখ সরালেন না। প্রাণীটার চোখ দুটো গোল ধরনের, ভুরু নেই। সারা গায়ে বাঁদরের চেয়েও বড় বড় লোম। হাত দুটো খুব লম্বা।

প্রাণীটা দু'হাত তুলে আবার একটা ভয়ংকর চিৎকার করে এগোতে লাগল কাকা-বাবুর দিকে। স্পষ্টই সে কাকাবাবুকে আক্রমণ করতে চায়। কাকাবাবু খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। এটা যদি ইয়েতি হয়, এটাকে মেরে ফেলা উচিত নয়। পৃথিবীর কেউ কখনো জ্যান্ত ইয়েতি ঠিক-মতন দেখেনি। রহস্যময় প্রাণী হিসেবে একে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু কাকাবাবুর নিজের প্রাণও তো বাঁচাতে হবে। তিনি ওকে একেবারে না মেরে পায়ে গুলি মেরে আহত করবেন ভাবলেন। সেই আওয়াজেও ও ভয় পাবে। রিভলভারের নলটা একটু নিচু করে তিনি ট্রিগার টিপলেন।

কিন্তু গুলি বেরুল না, শুধু খট করে একটা আওয়াজ হল। কাকাবাবু ব্যস্তভাবে আবার ট্রিগার টিপলেন, এবারও গুলি বেরুল না। সেই এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর রিভলভারে গুলি নেই। একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল তাঁর শরীরে। (ক্রমশ)

লোকমান্য তিলককে গান্ধীজী বোধহয় সবচাইতে বেশি শ্রদ্ধা করতেন। একবার গুজরাট রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক বৈঠকে গান্ধীজী ঠিক সময়মতোই উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু তিলকের আসতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। মীটিং আরম্ভ হতে গান্ধীজী উঠে প্রথমে তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তারপর বললেন, ভারতের স্বাধীনতা পেতে যদি আধ ঘণ্টা দেরি হয়, তা হলে তার সব দায় কিন্তু লোকমান্‌জীর।

অনেকরকম যেন

নুক্তক

বৌদি জিজ্ঞেস করেছিলেন : উলের কাঁটাটা কোথায় রেখেছিস রে? উত্তরে টুম্পি বলে : কোথায় যেন রেখেছিলাম, ভুলে গেছি।

একটু পরেই নন্তু জানতে চাইল : কাকুকে বলেছিলি সেই কথাটা? টুম্পি বলে : কী যেন বলার কথা ছিল?

মনে করিয়ে দেবার পর যেই বলেছে 'ও. হ্যাঁ, কারা যেন এসেছিল কাল রাত্রে. তোমাকে খুঁজতে', অমনি মার কাছে একটা ধমক খেল টুম্পি : অত যেন-যেন কোরো না সব সময়ে। মনটা থাকে কোথায়?

নন্তু হেসে মনে করিয়ে দেয় : শিখলি না সেদিন মন চাই, মন?

মিটে গেল ব্যাপারটা ওইখানেই. তবে টুম্পির একটু মুখভার হল। কাছে ডেকে বলি : শোন টুম্পি, মার কথায় মন খারাপ করিস না। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখতেন প্রথম বয়সে. ওঁকেও তখন ওইরকম করে বকত লোকে।

বকত? কেন?

রবীন্দ্রনাথও যে তোর মতো যেন-যেন করতেন খুব। শুনিসনি সে-সব লাইন? 'কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফুল তুলি।' সমালোচক তখন চোখ রাঙিয়ে বলতেন, অত যেন-যেন করলেই কবিতা হয় না।

ব্যস. সকালবেলা উঠেই টুম্পি রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেল।

নন্তুর কথায় কান না দিয়ে টুম্পি জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা কাকু, ওটা কি সাজিয়ে বলা হল? ওর মধ্যে তো কারো সঙ্গে কিছু মেলানো নেই।

না না, তা তো নেই-ই। এ তো হ'ল কথা বলার এক ভঙ্গি, অনিশ্চয়ের ভঙ্গি। ঠিক-মতো জানি না, কোথায় একটা অস্পষ্টতা আছে, সেইটে বোঝানো। আরো অনেকরকম 'যেন' আছে অবশ্য।

অনেকরকম?

হ্যাঁ, অনেকরকম। যেমন ধর, যদি বলি, 'এ কথাটা ভুলে যেয়ো না যেন', তাহলেই আরেকরকম 'যেন' হল না? এ যেন-টা সরিয়ে নিলেও মানেটা থাকে একই, তবু একটু জোর দেবার জন্য এল ওই বাড়তি শব্দ। গানে বা কবিতায় এটা কীভাবে আসে, শুনবি? 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।' অথবা ধর,

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

মানে, আমি চাই যে দগ্ধ করুক।

এখানে তো একটা মিলের কথা আছে?

হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সে তো 'সম' দিয়ে বলা হল, তৃণসম, ঘাসের মতো। যেন-র সঙ্গে তো যোগ নেই ওর। তবে 'যেন' দিয়েও মেলানো যায় নিশ্চয়। সে আবার আরেক-রকম হবে। কী নন্তুবাবু, বলবে না কি তেমন কোনো লাইন? মনে পড়ছে?

মেলানোর 'যেন' চাই? দাঁড়াও, ভাবি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে :

পায়ে ঠুনঠুন বাজে নুড়ি
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে
যেন পাগলের মতো ছোটে।

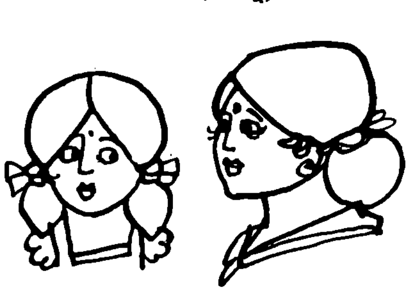
হয়েছে?

দিব্যি হয়েছে। নুড়ির ওপর জল বয়ে যাচ্ছে, যেন পায়ে মলের শব্দ, হাতে চুড়ির শব্দ। তারপর অবশ্য অনেকগুলো লাইন বাদ দিয়ে বলেছিস। মস্ত একটা ঝাঁপ মাঝখানে।

কবিতাটার নাম 'নদী' তো। যেন নদীতেই দিলাম একটা ঝাঁপ।

শুনলি তো টুম্পি, নন্তুর এই যেন-টা কিন্তু মেলানোর যেন। কবিতায় এ-লাইন থেকে ও-লাইনে ঝাঁপ, যেন নদীর এপার থেকে ওপারে। নন্তুও তাহলে সকালবেলা উঠেই রবীন্দ্রনাথ হ'ল।

বৌদি বললেন : রবীন্দ্রনাথ না, হনুমান।



তোমাদের লেখা, আরও

প্রসাদ

৭ই নভেমবরের প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের লেখা আরও কিছু আমার হাতে পৌঁছেছে। তার মধ্যে দুর্গাপুরের অতনু ঘটক ভাল লিখেছে। আর আসামের জাগী রোডের সুদিনকুমার ধরের নামও করছি, কেননা সুদিন আমাকে একটা দরকারি কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছে।

১ নম্বর আর ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর সুদিন এইরকম দিয়েছে :

Q.1. Where was Chameli?
Ans. Chameli was at home.
Q.4. Was she out in the garden?
Ans. No, she was at home.

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঠিক আছে, বলবার কিছু নেই। কিন্তু চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরটা পড়বার সময়ে মনে রাখতে হবে, বাগানটা চামেলিদের বাড়িরই বাগান। 'হোম' বলতে বাগান-টাগান সুদ্ধ একজনের বাসস্থান বোঝায়, আর তার মধ্যে বাড়িটিকে বলে "হাউজ"। আবার, যদি কেউ দশতলা অট্টালিকায় একটি দু' ঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে তবে সেই ফ্ল্যাটটিই তার হোম। তবে হোটেল-বোর্ডিঙে থাকলে অবশ্য আলাদা কথা, তাকে ঠিক হোম বলা যায় না।

যাই হোক, চামেলি যদি বাগানে থাকত তা হলে সেটা বাড়িতে থাকাই হত, যদিও বাড়ির ভেতরে থাকা হত না। এখন, চামেলি আছে কোথায়? বাড়ির ভেতরে আছে, বাগানে নেই।

Chameli is at home.
She's not in the garden.
She's in the house.

আবার চামেলি যদি বাগানে থাকে

Chameli is at home.
She's not in the house.
She's out in the garden.

ধরো, চম্বলের পার্টি যখন চলছিল, তাকে মাঝে-মাঝে বাড়ির ভেতরে যেতে হচ্ছিল এটা-ওটা আনবার জন্য।

Chambal had to go into the house every now and then.
Chameli never came out of the house into the garden.
Both Chameli and Chambal were at home.
Chambal was in the garden.
Chameli was in the house.



কিংবা একজন বাড়ির ভেতরে, আরেকজন বাইরের বাগানে, এ-কথাটা আরো ভাল করে বোঝাবার জন্যে :

Chameli was inside the house.
Chambal was out in the garden.

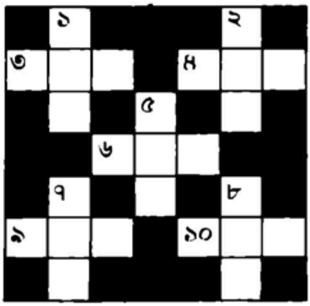
কিন্তু মা?

Mother was sometimes in the house and sometimes in the garden.
She was moving between the house and the garden.

অর্থাৎ ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর যদি সুদিন এইরকম লিখত, তাহলে ভাল হত:

Q.4. Was she out in the garden?
Ans. No, she was inside the house.

এর পরের বার থেকে আবার চামেলিদের গল্প আরম্ভ হবে।



অনেকদিন আগে একবার একটা উল্টো-শব্দসন্ধান দেওয়া হয়েছিল, অনেকের মনে থাকতে পারে। ছকের ফাঁকা ঘরগুলোয় পাশাপাশি যে-শব্দ বসবে, উপরে-নীচে বসবে তারই সার্থক অর্থাৎ অর্থযুক্ত উল্টো-রূপ। যেমন : পাশাপাশি যদি হয় সহসা, উপর-নীচে হবে সাহস। এই যখন শর্ত তখন শুধু পাশাপাশির সংকেত দিলেই যথেষ্ট, কী বলো!

পাশাপাশি : (৩) ফুলের সমাবেশ। (৪) কারাগার। (৬) চোখের কাজ। (৯) অঙ্গশিল্পী। (১০) লাল রঙের ফুল।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

	গো	পা		শি	খী	
হা		শা	ল	তি		পা
সু	ত				ন	ট
নো	ল	ক		জা	বা	লি
হা	তা				ব	পু
না		গ	ণ্ড	ক		ত্র
	ব	র্গ		চি	তা	

বড়-দাদুর একটা ছবি বাঁধাতে দিয়েছিল ছোট্‌কা। সেই ছবিটাই বাঁধিয়ে এসেছে।

আমি সরে যেতেই ছোট্‌কা বলল, "দেখেছিস কাণ্ড। মাপে ভুল করে দিয়েছে।"

আমি ছবিটার দিকে তাকালাম। চওড়া কালো বোর্ডের মধ্যে ছবিটা দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে। কাঠের



ফ্রেমটাও চকচকে কালো রংয়ের। ভুল যে কোথায়, ঠিক ধরতে পারলাম না।

ছোট্‌কা ততক্ষণে স্কেল বার করে কালো বোর্ডটা মাপতে শুরু করেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাপল। তারপর বলল, "কুড়ি ইঞ্চি বাই কুড়ি ইঞ্চি মার্জিনের বোর্ড দিয়েছে। আমি কি তাই চেয়েছিলাম?"

"তুমি কী চেয়েছিলে ছোট্‌কা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ছোট্‌কা উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর মজার মুখ করে বলল, "এক দিকে আমি যত ইঞ্চি মার্জিন বলেছিলাম তার [illegible] অংশের থেকে ৬ ইঞ্চি বেশি রয়েছে, অন্য দিকে যা রয়েছে তার [illegible] অংশের সঙ্গে ৬ ইঞ্চি যোগ করলে আমি যা চেয়েছিলাম সেই মাপের মার্জিন হত। বুঝলে সতুবাবু?"

আমি বুঝলাম, ছোট্‌কাকে ধাঁধায় পেয়েছে। চট করে যা বুঝলাম না, তা হল ছোট্‌কা কত ইঞ্চি বাই কত ইঞ্চি মার্জিনের বোর্ড দিতে চেয়েছিল। তোমরা বুঝেছ? এটাই হোক এবারের **প্রথম ধাঁধা**।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ সীতানাথবাবুকে বললেন ভূতনাথবাবু, "কাল আপনার ছেলেকে দেখলাম, বেশ লম্বা হয়েছে। বয়স কত হল?" সীতানাথবাবু জবাবে বললেন, "অবনীর কথা বলছ? ও বরাবরই একটু লম্বা। সাত বছর আগে ওর বয়স ছিল আমার খোকার বয়সের তিন ভাগের একভাগ। সাত বছর বাদে আমার বয়স হবে ওর তখনকার বয়সের দ্বিগুণ।"

সীতানাথবাবুর এখনকার বয়স কত? অবনীরই বা এখন কত বয়স?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শূন্য স্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও :

৪	৩	২	১	৬
৪	৬	?	৮	২
৮	৯	৭	৯	৮

চতুর্থ ধাঁধা ॥ অভিমান, আনন্দ, ইচ্ছে, ঈপ্সা। পঞ্চম শব্দটি কী হবে আন্দাজ করতে পারো?

গতবারের উত্তর ॥ (১) 'সিকি ও আধুলি' লেবেল যে-কৌটোটায়, সেটার থেকেই বার করতে হবে প্রথমে একটা পয়সা। সে-পয়সার মূল্য যদি সিকি হয়, বুঝতে হবে দুটো সিকি রয়েছে কৌটোটায়। যদি আধুলি হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে দুটো আধুলিই থাকবে—কেননা, তা না হলে ঠিক লেবেল হয়ে যায়। শর্ত মেলে না। যাই বেরোক না কেন, সেই অনুযায়ী 'সিকি' অথবা 'আধুলি' লেখা কাগজ অন্য কৌটো থেকে এনে এটাতে বসাতে হবে। এবার অন্য যে-দুটো কৌটো রইল, তার লেবেল ও 'সিকি ও আধুলি' লেবেল পাল্টাপাল্টি করে নিলেই প্রত্যেক কৌটোয় ঠিক লেবেল বসানো হবে। (২) 'এবং' শব্দটা। (৩) আধখানা গর্ত আবার হয় নাকি? (৪) ২৮।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল দরজার ছিটকিনির ছবি
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ পোকা মানুষের পায়ে ধরে?
উঃ ঝিঁঝি পোকা।

প্রঃ ইতিহাসের লংমার্চ কে প্রথম করেছিলেন?
উঃ নিশ্চয়ই তৈমুর লং।

প্রঃ কোন্ বাংলা শব্দ সবসময় ভুল উচ্চারণ করা হয়?
উঃ 'ভুল' শব্দটা।

প্রঃ আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক আছেন, যৎসামান্য ট্যাক্স দিয়ে দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের নামটা আন্দাজ করতে পারো?
উঃ নিশ্চয় শ্রীঅকিঞ্চিৎ কর।

সুসেন

মজার খেলা

এই খেলাটার নিয়ম হল, প্রত্যেককে এক মিনিট করে সময় দেওয়া হবে আর সেই সময়ের মধ্যে দেখার জন্যে দেওয়া হবে একটা মোটাসোটা বই। সে-বই উপন্যাস হতে পারে, রম্যরচনা হতে পারে, জীবনী হতে পারে, খেলাধুলোর বই হতে পারে। যে-কোনো বই। একটাই বই বেছে নেওয়া হবে আগে থেকে, সেই বইটাই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতে ঘুরবে।

যতজন খুশি ততজন যোগ দিতে পারে এই খেলাটায়। কোনো বাধা নেই। বইটা দেখার জন্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ঘড়ি ধরে এক মিনিট মাত্র সময় বরাদ্দ করা হবে। প্রত্যেককেই বলা হবে, এক মিনি-



টের মধ্যেই যত ভালভাবে সম্ভব বইটি যেন সে নাড়াচাড়া করে দেখে নেয়। এই ভাবে যখন সকলের বইটি দেখা শেষ তখন বইটি নিয়ে আলাদা কোনো জায়গায় লুকিয়ে ফেলো। এইবার প্রত্যেক খেলোয়াড়কে বলো কাগজ ও কলম নিয়ে বসতে। তুমি দশটা প্রশ্ন করবে, প্রত্যেকে তার নিজের কাগজে উত্তর লিখবে। যার উত্তর সব থেকে বেশি নির্ভুল হবে, সেই জিতবে।

প্রশ্ন দশটা তুমি বানিয়ে নিও। যেমন ধরো, বইয়ের নাম কী? লেখক কে? প্রকাশকের নাম কী? কবে বেরিয়েছে? কত পৃষ্ঠার বই? ছবি আছে কিনা? মলাটের রং কী? ভূমিকা আছে কিনা? এই ধরনের দশটি প্রশ্ন।

দেখবে, সঠিক উত্তর কত কম হয়। তা বলে, খেলাটা কিন্তু কম মজার নয়।

মজারু

হাসিখুশি



হরেন নরেন আর বরেন মাছ ধরার গল্প করছিল। হরেন বলছিল, "আমি এমন একটা মাছ ধরেছিলাম একবার সমুদ্রে, সে কী মাছ! আমি ছিলাম নৌকোর উপর, আর মাছটা ছিপের সুতো ধরে টানতে টানতে কতদূর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। ফিরে আসতেই লেগে গেল আমার দুদিন।"

নরেন বলল, "ও আর বেশি কথা কী, আমি একবার একটা মাছ ধরে নৌকোতে তুলতেই নৌকোটি ডুবে গিয়েছিল।"

বরেন ওদের কথা শুনে বলল, "আমার ব্যাপারটা এমন ঘটেছিল যে, তোমরা বোধহয় বিশ্বাসই করবে না।"

হরেন আর নরেন বলল, "বলো না কী হয়েছিল—তা ছাড়া মিথ্যে কথা আর কি তুমি বলবে?"

বরেন তখন বলল, "আমি সমুদ্রের একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিলাম। বঁড়শিতে কামড় দিতেই তাকে টানতে লাগলাম, কিন্তু মাছের সে কী জোর! ভাগ্যিস আমি দ্বীপের একটা পাহাড়ের সঙ্গে সুতোটা বেঁধে রেখেছিলাম। তিনমাস পর মাছটা টানাটানি করে ক্লান্ত হওয়ার পর সেটাকে দ্বীপের উপর টেনে তুলতেই,ওঃ,সেকথা ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে, দ্বীপটিই ডুবে গেল।"

ছবি অহিভূষণ মালিক



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৩৬ ॥

মারডেকা ফুটবলে রানার্স হয়ে কুয়ালালামপুর থেকে ফিরে আসার কয়েকমাস পরে বাংলা দল গেল মাদরাজে জাতীয় ফুটবলে খেলতে। আমি কিন্তু দলে ছিলুম না।

ক'বছর ধরেই আমি সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে পারছিলুম না, ক্রিকেট মরসুমের মাঝে খেলার আসর বসছিল বলে। জাতীয় ফুটবলে আমি খেলেছি ছয়বার। তার মধ্যে তিনবার বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতেছে। কিন্তু আমার অধিনায়কত্বে একবারও না। অধিনায়ক ছিলুম বাষট্টি ও একষট্টির প্রতিযোগিতায়। তারপর আর খেলিওনি জাতীয় ফুটবলে। আগেই বলেছি, ক্রিকেট খেলার জন্য। তাছাড়া বাষট্টিতে ভারত দলের অধিনায়ক হবার জন্যও বটে। তখন ফুটবলে আমার খুবই ভাল ফর্ম। যদি খেলতাম, তাহলে বাংলা যে ওই সময়ে আরও দু' তিনবার সন্তোষ ট্রফি জয় করতই—এ-কথা বলছি না, কিন্তু ফুটবলে যে-বাংলার এত রমরমা, জাতীয় ফুটবলে সেই বাংলার দুঃসময় গেছে টানা ছ'টি বছর—তেষট্টি থেকে আটষট্টি পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাংলা একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

ভারতের অধিনায়ক হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সোনা-রুপো জয় করে ফিরেছি, কিন্তু বাংলার অধিনায়ক হয়ে সন্তোষ ট্রফি জয় করতে পারিনি বলে আমার একটা দুঃখ রয়ে গেছে। ঠিক দুঃখ বলব না। কী যেন পাইনি, কী যেন হারিয়েছি—মনের মধ্যে এমন একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। সবার আশা তো পূর্ণ হয় না।

ঈশ্বর কিন্তু আমার অনেক আশাই পূর্ণ করেছেন। ফুটবল খেলে পেয়েছি অনেক কিছু। অঢেল কাপ মেডেল, অসংখ্য প্রাইজ, বিস্তর ট্রফি, অনেক সম্মান, অনেক প্রতিষ্ঠা। এবং মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা। তবে ভালবাসাই বলো আর সম্মান-সমাদরই বলো—এ-সব বেশি জুটেছে ম্যাচ জেতার পর, কিংবা ভাল খেলে আসর মাত করার ফলে।

আমি কিন্তু মনে করি, সাধারণ মানুষ কারো প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভালবাসা দেখায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, এবং চোখের আড়ালে থাকলেও যে-সম্মান দেখায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ সম্মান।

আমার খেলোয়াড়-জীবনে সেই ভালবাসা এবং সেই সম্মান এসেছে ওই চৌষট্টি সালে মাদরাজের জাতীয় ফুটবল-আসরে।

মাদরাজের ফুটবল-অনুরাগীরা এবং প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা কী করেছিলেন জানো? আমার এক বিরাট ছবি কার্ডবোর্ডের উপর সেঁটে স্ট্যাচুর মতো করে কর্পোরেশন স্টেডিয়ামের মেন গেটের উপর স্থাপন করেছিলেন। সন্তোষ ট্রফির খেলা চলেছিল তিন সপ্তাহ ধরে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওই তিন সপ্তাহ আমার ছবি ছিল মেন গেটের উপরে। অথচ আমি মাদরাজের খেলোয়াড় নই। প্রতিযোগিতায় খেলছি না। সেখানে হাজির নেই। ফুটবল থেকে রিটায়ারও করিনি। আমার প্রতি মাদরাজের মানুষের এই ভালবাসা কি মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায়? তখন বয়স কম ছিল। ভাল করে ভেবেও দেখিনি। এখন যখন ভাবি আজ পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড় কি তার ক্রীড়া-জীবনে এমন সম্মান পেয়েছে, তখন মনে হয়, আমি জীবনে ওর চেয়ে বড় কিছু পাইনি। সোনা-রুপো-ট্রফি সব তুচ্ছ মনে হয়।

আমাকে অনেকেই ঋণী করে রেখেছেন। আমার ক্লাব মোহনবাগানের কাছেও আমার ঋণ অপরিশোধ্য। ওই চৌষট্টি সালেই ক্লাবের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে পঁচাত্তর দিন ধরে চলেছিল প্লাটিনাম জুবিলির বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। ঠিক টোকিও অলিম্পিকের পরেই। নানা রকমের খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছিল মিনি এশিয়ান গেমসের আদলে। এসেছিল অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী পশ্চিম জার্মানির অ্যাথলেটিক টীম। এসেছিল হাঙ্গারির তাতাবানিয়া ফুটবল দল। এসেছিলেন বিশ্বখ্যাত বহু ক্রিকেট-খেলোয়াড়, বহু টেনিস-তারকা এবং অলিম্পিকে শেষ স্বর্ণপদক-জয়ী ভারতের হকি খেলোয়াড়রা।



সে এক বিচিত্র সমাবেশ। হরেক রকমের খেলার মেলা। প্রাচীন অলিম্পিকের আচার অনুযায়ী পুজো-অর্চনা-হোম-আরতি এবং মশাল হাতে রিলে দৌড় ছিল প্লাটিনাম জুবিলির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ। মোহনবাগান মাঠের দীপাধারে পূতাগ্নি স্থাপনের সম্মান দেওয়া হয়েছিল আমাকেই। আমার জীবনের আর এক স্মরণীয় মুহূর্ত। প্লাটিনাম জুবিলি এবং খেলাধুলো সম্পর্কে লিখব পরে। আজ ওই জুবিলি অনুষ্ঠানের এক আনন্দময় উৎসবের কথা বারবার মনে পড়ছে সম্প্রতি করাচিতে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস হকি কাপের খেলায় ভারতের ফলের পরিপ্রেক্ষিতে।

টোকিও অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানকে ১—০ গোলে হারিয়েই ভারতীয় হকি দল কলকাতায় এসেছিল জুবিলি উৎসবে খেলতে। সেই পাকিস্তানের কাছে ভারত হারল ১—৭ গোলে। হেরেছে অবশ্য আরো অনেক বার। একবার ০—৬ গোলেও। কিন্তু সেদিনের কথা ভেবে এখন মনে হচ্ছে কী ছিল ভারতের হকি আর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। রোম অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক খোয়াবার পর টোকিওতে সোনা জয় ছিল যেন হারানিধি ফিরে পাওয়া। তাই জুবিলির সময় হকি-খেলোয়াড়দের সমাগমে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল কলকাতায়।

তোমরা যদি কোনো লাইব্রেরির ফাইলে চৌষট্টি সালের দশ নভেম্বর তারিখের "আনন্দবাজার" পত্রিকাটি খুঁজে পাও, তবে প্রথম পাতায় একটি সুন্দর ছবি দেখতে পাবে। কী ছবি জানো? একটি ফুলের মালা। সেই মালার মধ্যে অলিম্পিকে ভারতের শেষ সোনা জয়ী খেলোয়াড়দের মুখগুলি ভাসছে। আঠারোজন খেলোয়াড়, কোচ এবং হকি ফেডারেশনের তখনকার সভাপতি অশ্বিনীকুমার—প্রত্যেকের গলায় ওই রকমের একটি করে মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বড় হোটেলে সকলকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করে। কে আপ্যায়ন করেছিলেন এবং ওই অভিনব মালা দিয়েছিলেন জানো? আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং প্লাটিনাম জুবিলি কমিটীর বিশিষ্ট সদস্য শ্রী অশোককুমার সরকার। উৎসবমুখর

হোটেলে হাসি ও আনন্দের মধ্যে শ্রীসরকারকে কাঁধে তুলে অলিম্পিক খেলোয়াড়দের নাচানাচির কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না।

চৌষট্টি সালটি ছিল নানা কারণে ঘটনাবহুল। জুবিলি উৎসবের মাঝেই আমরা ডুরান্ড কাপে খেলতে গিয়েছিলুম এবং জয়ী হয়ে ফিরে এসেছিলুম। ফাইনালে ২—০ গোলে হারিয়েছিলুম আমাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে। তার আগে সেমিফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ০—১ গোলে হেরেছিল আমাদের কাছে। আমিই গোলটি করেছিলুম। ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে উঠেছিল বি এন আর-কে ২—১ গোলে হারিয়ে।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আমাদের গোল দুটি করেছিল অরুময় এবং অশোক চ্যাটার্জি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক যদি পেনাল্টি-কিক মিস না করত তবে আমরা পাঁচবার এবং পর পর দুইবার ডুরান্ড কাপ জিততে পারতুম কিনা বলা শক্ত। খেলা আরম্ভের পর পাঁচ মিনিটের মাথায় অবশ্য অরুময় গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে রাখে। নয় মিনিটে ইস্টবেঙ্গল পায় পেনাল্টি-কিক। অসীমের বাঁক-খাওয়ানো দারুণ জোরালো শট বাইরে চলে যায়। কিছু পরে গোল করার আর একটি অতি সহজ সুযোগ পেয়েও অসীম গোল করতে পারে না। বোধহয় আগে পেনাল্টি মিস করার প্রতিক্রিয়ায়। এর পর গোটা ইস্টবেঙ্গল টীমই দমে যায়। সেই সুযোগে দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটে অশোক করে আমাদের দ্বিতীয় গোল। ওই সময়ে ইস্টবেঙ্গলের স্টার খেলোয়াড় ছিল পরিমল দে। পরিমলেরও সেদিন কী হয়েছিল কে জানে!

পরিমলের ডাক-নাম জংলা। বাঘাদার হাতে তৈরি খেলোয়াড়। উয়াড়ি ক্লাব থেকে ইস্টবেঙ্গলে এসে বিখ্যাত বলরামের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিল ট্যালেন্ট ও স্কিলের জোরে। জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলে আমার শূন্যস্থান দখল করেছিল যোগ্যতাবলে। বাষট্টি থেকে ঊনসত্তর পর্যন্ত মাঝের এক বছর বাদে সাত বছর খেলেছে বাংলা দলে। আটষট্টিতে ছিল বাংলার অধিনায়ক। মন-মাতানো ফুটবল খেলত পরিমল। খুবই স্কিলফুল খেলোয়াড় ছিল। ছোট জায়গার মধ্যে পায়ের কাজ ছিল





(উপরে) টোকিও অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী ভারতীয় হকি দলের ক্যাপটেন চরণজিৎ সিংকে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। (নীচে) মালার মধ্যে খেলোয়াড়দের মুখ।

আঁকতে পারি

সৌরেন বসু

আঁকবি কিসে, আঁকবি কিসে
বলল বিশে--
'রং-তুলি সে
বুলিয়ে দিয়ে তিনটে শালিখ
আঁকতে পারি,
এক শালিখের দেমাক ভারী :
আর-একটি খুব ঝগড়া করে
প্যাস্‌টেলে তাই আঁকলে পরে-
ঘাসের ভিতর ঠোঁট দিয়ে তো
আর-এক শালিখ
ফড়িং ধরে।'

দেখার মতো। যেমন ছিল পরিচ্ছন্ন পাস, তেমন পায়ে ছিল রেডি জোরালো শট। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে সে যা পেয়েছে তা গর্ব করে বলার মতো। একসময় জনপ্রিয়তার প্রায় তুঙ্গে উঠেছিল। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের অনেক গোল করেছে জংলা। আমার মনে দাগ কেটে রেখেছে একটি ম্যাচে তার সামান্য সময়ের খেলা। মিনিট কয়েক খেলেছিল। তার মধ্যে দু-চারটি বল ধরেছিল। বুলেটের মতো একটি শট গোল-পোস্টের সামান্য একটু উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। একই ধরনের আর-একটি শট ঢুকেছিল গোলে। ওই গোলেই খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। কোন খেলাটি বলো তো। আগেই বলছি না। একটু আভাস দিচ্ছি।

খেলাটি দেখেছিল প্রায় ৮০ হাজার দর্শক। খেলার পর জয়ের আনন্দে গ্যালারিতে দর্শকদের হাতে-হাতে জ্বলেছিল খবরের কাগজের মশাল। ওই খেলার পর থেকেই তো কলকাতার ফুটবলে বড় জয়ের পর মশাল জ্বালানোর রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। এখনো যদি সেই খেলাটিকে ধরতে না পেরে থাকো তবে জেনে নাও—খেলাটি ছিল সত্তর সালে ইডেনে ইরানের পাস ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীল্ড ফাইনাল খেলা। (ক্রমশ)

মণিমেলার খবর

সম্প্রতি মণিমেলা মহাকেন্দ্রের আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ সমাপ্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং। প্রায় পাঁচ হাজার মণিভাইবোন সুন্দর শোভাযাত্রা করে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সমবেত হয় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। কেন্দ্রপ্রধান মণিমেলার পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে একটি স্কার্ফ উপহার দেন। ব্যান্ডের তালে তালে অভিবাদন জানায় শিশুরা

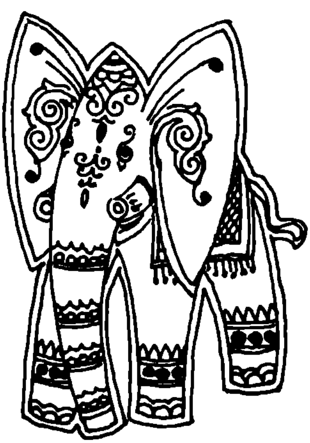
ব্যায়াম, ড্রিল, নৃত্য, যোগাসন ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।

শিশু কয়েদীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বারাসত সংশোধনাগার ও প্রেসিডেন্সি জেলের শিশুরা।

স্টেডিয়াম মঞ্চে বিভিন্ন রাজ্যের শিশুদের আবৃত্তি ও অন্ধ শিশুদের গানের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল।

মুক্তাঙ্গনে সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের শিশু-চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় তিনদিন ধরে।

বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ব্রিগেডিয়ার নির্মলেন্দু ঘোষ, ভি বালসারা, ডঃ রমেশ দাশ, স্বামী রামদেবানন্দ এবং উৎপল হোমরায়।



গাছে টাকা ফলে

(জহরোল্টের উপকথা)

আরতি দাস

কেউ জানে না, কোন গাছে টাকা ফলে। জানতে পারলে, অনেকেই সে গাছের চারা এনে পুঁতে দিত। তারপর ডালপালা ভরে যখন রুপোর টাকা ফলত, ঝুড়ি ভর্তি করে কুড়িয়ে নিত।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব সোজা। একটা সিকি মাটিতে পুঁতে দিলেই তা থেকে টাকার গাছের চারা বেরোয়। আজগুবি গল্প? মোটেই নয়। ঘটনাটা পুরোপুরি না শুনলে কারুরই বিশ্বাস হবে না।

আতপাতনগরে একজন খুব ধনী লোক ছিলেন। তাঁর টাকাকড়ি ধন-দৌলত হিরে-জহরতের অভাব ছিল না। বাগান-ঘেরা যে বিশাল বাড়িতে তিনি থাকতেন, সেই বাড়িটাকে সবাই বলত রাজবাড়ি। আর তাঁকে বলত, রাজা-মশাই।

একদিন সেই ধনী লোকটি মজলিশঘরে বসে আছেন, এমন সময় এক গরিব ব্রাহ্মণ এসে ভিক্ষা চাইতেই তিনি একশোটি টাকা দিলেন। ব্রাহ্মণ সে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "রাজা-মশাই, একশো টাকায় আমার দরকার নেই। আপনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা রোজগার করেছেন, তার থেকে আমায় একটি পয়সা দিন।"

এ কথা শুনে তো ধনী লোকটির মাথায় বাজ পড়ল। সারাজীবন কষ্ট করে এক পয়সাও তিনি রোজগার করেননি কখনও। এত টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সবই বাপ-ঠাকুর্দার সূত্রে পাওয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ব্রাহ্মণকে বললেন, "আপনি দুদিন পরে আসুন। যা পারি দেব।"

পরের দিন খুব ভোরে উঠে সেই ধনী লোকটি নিজের দামি রেশমের পোশাক ছেড়ে ছেঁড়া, ময়লা একটা ধুতি পরলেন। হিরে-মুক্তোর আংটি আর জরির কাজ করা মখমলের জুতো খুলে রেখে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।

শহর ছেড়ে অনেক দূরের এক গাঁয়ে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেল। তখন বেশ রোদ



উঠেছে। গাঁয়ের এক গাছতলায় দেখলেন, এক কুলির সর্দারকে ঘিরে, অনেক জনমজুর ভিড় করেছে। ধনী ভদ্রলোকও কুলির কাজের আশায়, মজুরদের পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছেঁড়া পোশাকে কেউ তাঁকে চিনল না।

কুলির সর্দার তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মাটি কোপাতে পারবে?"

ধনী লোকটি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। তারপর সর্দারের কাছ থেকে ঝুড়ি আর কোদাল চেয়ে নিয়ে মাটি কোপাতে লেগে গেলেন।

এদিকে বেলা যত বাড়ছে, রোদ ততই চড়া হচ্ছে। বারোটা বাজতে না-বাজতেই রাজামশাই রোদের তাতে একেবারে গলদঘর্ম। কোদালের ঘষা লেগে দু'হাতের আঙুলে ফোসকা পড়ে গেল। ফোসকা গলে গিয়ে শেষে হাতের এমন দুরবস্থা হল যে, কোদাল ধরবার আর কোনও ক্ষমতাই তাঁর রইল না। তখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন মাটিতে।

মজুরটিকে ওভাবে বসে পড়তে দেখে কুলিসর্দার আস্তে আস্তে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল, "তোমার যা হাল দেখছি, তাতে তোমার দ্বারা আর মাটি কোপানো হয়ে উঠবে না। কোদাল আর ঝুড়ি রেখে এসো। আর এই নাও তোমার মজুরি।" এই বলে একটা সিকি ছুঁড়ে দিল তাঁর দিকে।

আতপাতনগরের সেই ধনী লোকটি সিকিটা হাতে করে বাড়ি ফিরে এলেন। নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে ফোসকার ঘায়ে ওষুধ লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। দুদিন পরে স্নানটান সেরে, খুব দামি পোশাক পরে মজলিশঘরের আড্ডায় এসে বসলেন তিনি। তাঁর পকেটে সেই খেটে-রোজগার-করা সিকিটা।

সেই ব্রাহ্মণ এসে আবার ভিক্ষে চাইলেন। তিনি সিকিটা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "এ আমার কষ্টের রোজগারের পয়সা।"

ব্রাহ্মণ খুব খুশি হয়ে সিকিটা নিয়ে চলে গেলেন।

একে একে দিন মাস বৎসর পার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের কথা আর কারুরই মনে নেই। একদিন ধনী লোকটির বাড়ির পুজোর ফুলের জন্য কয়েকজন লোক ব্রাহ্মণের বাড়ি এসে দেখতে পেল, পেছনের উঠোনে মস্ত এক টাকার গাছ। সব ডালপালায় চকচকে রুপোর টাকা ফলেছে। ফুলটুল না নিয়েই তারা ছুটল মনিবের কাছে। বলল, "রাজামশাই, তাজ্জব এক ব্যাপার দেখে এলাম। ভিক্ষে করে খান যে বামুনঠাকুর, তাঁর বাড়ির পেছনে গাছভর্তি টাকা ফলেছে।"

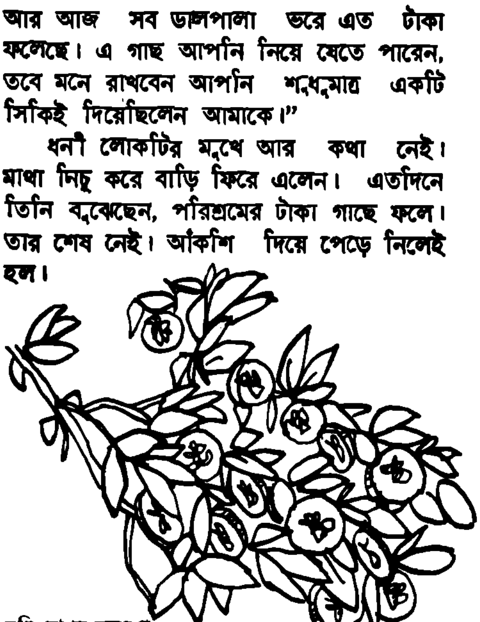
খবরটা শুনেই ধনী ভদ্রলোক ভারী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, "এক্ষুনি লোকলশকর, সেপাই নিয়ে চলে যাও। শেকড়সুদ্ধ গাছটাকে উপড়ে নিয়ে এসো।"

দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ি। কোদাল, খন্তা, শাবল হাতে লোকলশকর এসে জমল টাকার গাছটা খুঁড়ে তোলার জন্যে।

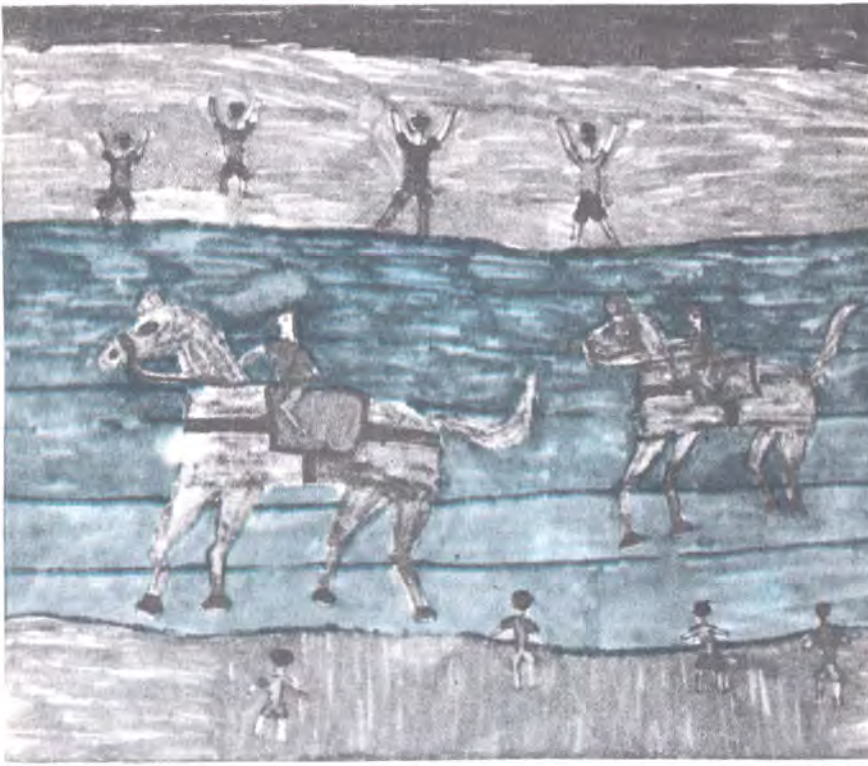
কিন্তু ব্রাহ্মণ এক কথায় 'না' বলে হটিয়ে দিলেন ওদের। শেষে বললেন, "এ গাছ আমি কাউকে ছুঁতে দেব না। আগে রাজামশাই নিজে আসুন, তারপর যা হয় হবে।"

সেপাইদের মুখে খবর পেয়ে ছুটে এলেন ওদের মনিব। ব্রাহ্মণ তাঁকে সমাদরে নিজের দাওয়ায় বসিয়ে বললেন, "রাজামশাই, আপনি আমাকে একটি সিকি দিয়েছিলেন, মনে আছে? আমি সেই সিকিটি যত্ন করে, মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। কষ্ট করে আপনি রোজগার করেছিলেন বলেই তা থেকে টাকার গাছ জন্মেছে। আর আজ সব ডালপালা ভরে এত টাকা ফলেছে। এ গাছ আপনি নিয়ে যেতে পারেন, তবে মনে রাখবেন আপনি শুধুমাত্র একটি সিকিই দিয়েছিলেন আমাকে।"

ধনী লোকটির মুখে আর কথা নেই। মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে এলেন। এতদিনে তিনি বুঝেছেন, পরিশ্রমের টাকা গাছে ফলে। তার শেষ নেই। আঁকশি দিয়ে পেড়ে নিলেই হল।



ছবি মাখন দত্তগুপ্ত



ছবি এ'কেছে **কনিষ্ক দত্ত** (বয়স ৮)



রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা—
তার মনটি বড় তাজা,
সে খেত আলুভাজা।
এক যে ছিল রানী—
তার নামটি যে সর্বাণী,
সে খেত ঠাণ্ডা পানি।
শর্মিলি গুপ্ত (বয়স ৭)

জানলা দিয়ে



সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। সেই সঙ্গে সোঁ-সোঁ করে বাতাস বইছিল বলে হাড়-কাঁপানো শীতও পড়েছিল। মনে হচ্ছিল পিঁয়াজি মুড়ি খেয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু উপায় ছিল না। সামনে পরীক্ষা বলে বাবা পড়তে বসতে বললেন। পড়াতে কিছুতেই মন বসল না।

কিশলয় বই খুলে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিলাম। একটা কাক কুল গাছটার মাথায় বসে ভিজছিল। দুটো গরু শুয়ে ছিল তার নীচে। পাশের বাড়ির ঘুলঘুলির ফোকরে চড়াই পাখিগুলো কিচমিচ করছিল, আর তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। দূরে কোথাও একদল কুকুর মারামারি করছিল। তার চিৎকার ভেসে আসছিল বাতাসে।

নীলাঞ্জন অধিকারী (বয়স ১০)

আমার রেকর্ড

অনেকদিন আগে আমরা দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম এক স্কুলে। বাবা বলছিলেন, আমাকে ওই স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

"আমি এখানে কিছুতেই থাকব না," আমি বাবাকে বললাম। বাবা হাসলেন। ওই স্কুলে যাওয়ার দিন সকালে আমার জ্বর হল। তখন জুন মাস। ওখানে ভরা বর্ষা। কেউ বুঝতে পারেনি যে, আমার জ্বর হয়েছে। আমরা হেঁটে হেঁটে পাহাড়ে উঠলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার ভাই ছিল বাবার কোলে।

আমি মাকে বললাম, "আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।"

মা বললেন, "তুই খুব ভারী, তোকে আমি কোলে নিতে পারব না।" আমি হাঁটতে লাগলাম। একটু পরে বসতে চাইলে বাবা রেগে বললেন "হচ্ছেটা কী? এখনও আধ মাইল রাস্তা বাকি। জোরে চল তো দেখি।"

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেই স্কুলে যখন পোঁছলাম, তখন আমার অবস্থা কাহিল। এদিক-ওদিক অনেক সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটেছিল, কিন্তু কিছুই আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল না। স্কুলের ছেলেমেয়েরা টিফিন করছিল।

আমি খুব ক্লান্ত হয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। আমাকে দেখে স্কুলের মিস মাকে বললেন, "ও কি কিছু খাবে?"

মা বললেন, "না, ও এখন খাবে না।"

স্কুলে কিছুক্ষণ থাকার পরে আমরা আবার হেঁটে ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে মা আমার কপালে হাত দিয়ে বললেন, "আরে! তোর তো ভীষণ গা গরম, জ্বর হয়েছে নাকি?"

তখন আমার মাত্র চার বছর বয়েস। সেই বয়েসে আমি প্রায় একশো তিন ডিগ্রি জ্বর নিয়ে এক মাইল পাহাড় ভেঙেছিলাম। এটা আমার রেকর্ড।

বিস্ময় রায় (বয়স ১০)



ছবি এঁকেছে **মোম মতিলাল** (বয়স ৬)



ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার সাফারি পার্ক

দিলীপ ভট্টাচার্য

টুপ্‌পা যেন ওর চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ যেন গল্পের সেই 'চাঁদের দেশ'। কী অপরূপ দৃশ্য চারদিকে! কত রকমের জীবজন্তু, পাহাড়, সুড়ঙ্গ, গুহা, নদী, নালা, ঝিল আর খুদে মরুভূমি।

কু-ঝিক-ঝিক করে ট্রেন ছুটে চলেছে জঙ্গলের পথে। ট্রেনের মধ্যে টুপ্‌পা, ওর দিদি এবং আরও অনেকে। কামরার গায়ে গায়ে জীবজন্তুর ছবি আঁকা, দুদিকে পাহাড় আর কত রকমের গাছগাছালি। যেতে যেতে একটা ঝিল পড়ল বাঁদিকে। ওই জলে নাকি কুমির ঘুরে বেড়াবে। ছোটকাকুই ওদের নিয়ে গেছে আবার ওই দেশে। কলকাতার সাফারি পার্ক। সল্ট লেকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গড়ে উঠছে শিশুদের এই সাফারি পার্ক। কাজ আরম্ভ হয়েছে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে। শেষ হওয়ার কথা আগামী বছরের মাঝামাঝি। কাজ এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

ছোটদের যত সেরা বই



শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হর্ষবর্ধনের মতোই, নি ত্য ন তু ন। বাংলা সাহিত্যের হাসির গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগ, এক চিরকালীন চিরনবীন প্রতিষ্ঠান। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখন তিনি কম লিখছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, এখনও কিছু-কিছু গল্প তবু লিখছেন। সেইরকম কিছু গল্প নিয়েই বেরিয়েছে তাঁর নতুন বই—'লাভের বেলায় ঘণ্টা।' হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনকে নিয়ে লেখা গল্পও যেমন রয়েছে এই বইতে তেমনই রয়েছে নানান মজাদার পরি-স্থিতির তীব্র কৌতুককর কাহিনী। প্রতিটি গল্প হাসি-জাগানো, প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র অনাবিল হাসির অনিঃশেষ উৎস।



মনোজ বসু এক দারুণ চরিত্র উপহার দিয়েছেন—ওস্তাদ নটবর। যত রকমের ভূত রয়েছে—টেকো ভূত, কালা ভূত, শঙ্খিনী-শাকচুন্নী, ব্রহ্ম-দত্যি, পেত্নী, কিম্ভূত, অদ্ভুত—সকলে নটবরের কথায় ওঠে বসে। হবে না কেন বলো? নটবর যে মস্ত বড় এক গুণিন। মন্তর-তন্তর, তুক-তাক, তাগা-তাবিজ, গুণ-জ্ঞান—সব তার নখদর্পণে। তাই যত রাজ্যের ভূত-প্রেত আর দৈত্য-দানো তাকে ভয় করে চলে। এহেন নটবরের ভূত-তাড়ানোর সব অদ্ভুত গল্প ও আরও অনেক গল্প নিয়ে অদ্ভুতুড়ে বই—'ওস্তাদ নটবর'। ছোটদের-বড়দের সকলের ভাল লাগবে।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৫ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুম্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **শঙ্করীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলে-দের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** পাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **পার্থ-সারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৪ রসায়নের ভেল্কি ৩ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাই-বাগানের ভূত ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

চল্লিশ একর জমির বিচিত্র দেশ। সাড়ে তেরশো মিটার জায়গা নিয়ে খেলনা-ট্রেনের লাইন বসেছে। পথে কোথাও সুড়ঙ্গ, কোথাও সেতু, কোথাও জঙ্গল, কোথাও বা পাহাড়। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে সীমানা টানা। মাঝে জালের বেড়া দিয়ে ঘেরা 'ডিয়ার পার্ক'। এই পার্কে থাকবে নানা ধরনের হরিণ, বেড়াল, বুনো শুয়োর। ডিয়ার পার্কের কিছুটা দূরেই দেড় একর জমির ওপর তৈরি হচ্ছে 'স্নেক পার্ক'।

যে ভদ্রলোক সাপের পার্কটি সাজাচ্ছেন তিনি এর মধ্যেই বাক্স-বন্দী করে নানা রকমের সাপ এনেছেন। বিষাক্ত সাপের মধ্যে আছে চন্দ্রবোড়া, গোখরো, আর শাঁখামুটি। তাছাড়া আছে কালনাগিনী, বেতআছড়া, বালিবোড়া, লাউডগা, তুতুর, ময়াল স্বর্ণগোধিকা, দাঁড়াস আর তক্ষক।

পশ্চিম দিকে আধ একর জমিতে গড়ে উঠছে আট লাখ টাকা খরচা করে পক্ষিশালা, মহারাষ্ট্রের এক স্থপতি এর রূপকার। সেখানে থাকবে সোনাজঙ্ঘা, হাড়গিলে, মরাল, তিতির, ছাতারে, সারস, ডাহুক, হুক্না, জলপিপি, টিটি, হরিয়াল, টিয়া, পেঁচা, রাত-চরা, মাছরাঙা, ধনেশ, দুধরাজ, খঞ্জনা, শ্যামা, দোয়েল, চোরপাখি, গল্পের টুনটুনি, বাঁশপাতি ইত্যাদি পাখি।

লাল সিগন্যালে বাধা পেয়ে খুদে ট্রেনটা থামল। কাকুর সঙ্গে ওরা উঠে এল পাহাড়ের মাথায়। কাকুই দেখিয়ে দিয়েছেন কোথায় হবে টিকিট-ঘর, স্টেশন, রেস্টুরেন্ট, রক-গারডেন, ঝর্না, ট্রী-হাউস, সুড়ঙ্গ আর গুহা। পাহাড়ের ভেতরে থাকবে পঞ্চাশ মিটার লম্বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ, সে পথেই যাবে খেলনা ট্রেন। ঝিলের পাশে তৈরি হবে বিশাল আকারের নকল শামুক, ব্যাঙের ছাতা, নকল গাছের মাথায় বাড়ি, বসার জায়গা ইত্যাদি।

খেলনা ট্রেন থেকে নামবার সময় টুপ্পা দেখল ইঞ্জিনের পেছনে চারটে বগি আছে। প্রতিটি বগিতে ষোলটি আসন। সবার শেষে গার্ডের গাড়ি। দুটো বগিতে এখন ছবি আঁকার কাজ চলেছে। এর মধ্যেই আঁকা হয়ে গেছে দারুণ-দারুণ বাঘ, বাঘের বাচ্চা, পান্ডা আর ভাল্লুক। আরও অনেক সুন্দর ছবিতে ঝলমল করবে খেলনা গাড়ি।

ছবির মজা



মোট ছটি বস্তু আছে এখানে। তার মধ্যে পাঁচটি কিনতে হয় জোড়ায়-জোড়ায়। শুধু একটি ছাড়া। সেটি কোন্‌টি?



ভারী সুন্দর এই ছবিটি। তাই না? এবারে রঙিন পেনসিল দিয়ে এই ছবিটিকে রঙিন করে তোলো।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দিল্লি টেস্টের বাদশাহ

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

''দ্যাখো, তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। তাই, নিজেকে ক্লান্ত মনে হলেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে বলবে।''

"না ক্যাপ্টেন, আমি ঠিক চালিয়ে যাব।"

গত ৫ ডিসেম্বর দিল্লির ফিরোজ শা কোটলা স্টেডিয়ামে এই রকম কথোপকথন হচ্ছিল এক তরুণ ফাস্ট বোলার আর তাঁর দেশের অধিনায়কের মধ্যে। সিকান্দার বখত এবং আসিফ ইকবাল। আসিফ নিশ্চয়ই সেদিন মনে মনে অনুশোচনা করেছিলেন, প্রথম টেস্টে সিকান্দারকে বাদ দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আসিফ লিখেছেন, ''একজন ফাস্ট বোলারের মুখে এমন কথা শুনতেও ভাল লাগে। আমি হলফ করে বলতে পারি সিকান্দারের মতো উৎসাহ ও মনোবল আছে,



ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য



সিকান্দর বল করছেন

এমন বোলার পেলে যে-কোনও ক্যাপ্টেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন।"

সত্যি, দিল্লিতে কী খেলাই না খেললেন সিকান্দার! প্রথম ইনিংসে ২০.১-২-৬৯-৮। এই আটের মধ্যে গাভাসকার, বেঙ্গসরকার চৌহান, কিরমানি, কপিল ও বিনি প্রত্যেকেই ছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও তিনটি উইকেট। দিল্লিকে সেদিন জয় করে নিয়েছিলেন সিকান্দার। যথার্থ বাদশাহের মতোই।

শুধুই কি দিল্লিতে? দিল্লিতে তো সবে শুরু। পরে বোম্বাইতে তৃতীয় টেস্টে এবং কানপুরে চতুর্থ টেস্টেও সিকান্দার প্রমাণ করেছেন যে, আগামী কয়েক সিরিজে পাকিস্তানের নতুন বল নিয়ে আক্রমণের ভার ইমরান বা অন্য কারও সঙ্গে তিনি পাবেন। বোম্বাইতে পাকিস্তান হেরেছে বটে, কিন্তু প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানকে অনুকূল অবস্থায় এনে দিয়েছিলেন সিকান্দার (ও ইকবাল কাসিম)। ২২.১-৫-৫৫-৫। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও দু'টি। কানপুরে প্রথম ইনিংসে ভারতের প্রায় ভরাডুবি হচ্ছিল—এক সময় স্কোর ছিল ৬৯/৮—তার মূলেও ছিলেন সিকান্দার (এবং এহতেসামউদ্দিন)। সিকান্দারের গড় প্রথম ইনিংসে ২৪—৯—৫৬—৫। আর পঞ্চম উইকেটটি পাওয়া মাত্রই তিনটি টেস্টে (তখনও পর্যন্ত) ২০টি উইকেট পেয়ে ভাঙলেন ফজল মামুদের রেকর্ড। ফজল ১৯৬০-এ পাঁচ-টেস্টের সিরিজে ২০টি উইকেট নিয়েছিলেন।

তাই রোগাটে, লম্বা এই বাইশ বছর বয়েসি যুবকটি (জন্ম ২৫ আগস্ট ১৯৫৭) যদি ভারতীয় শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করে থাকেন, তাহলে অবাক হবার কিছুই নেই। আর-কারও কথা বলতে পারি না, গাভাসকারের কি একটু সিকান্দার-ভীতি হয়নি? কেন? গাভাসকারের এই ইনিংসগুলিই তার উত্তর দেবে : গাভাসকার ক বারি বো বখত ৩১ (দ্বিতীয় টেস্ট প্রথম ইনিংস), গাভাসকার ক বারি বো বখত ২১ (দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় ইনিংস), গাভাসকার ক কাদির বো বখত ৪ (তৃতীয় টেস্ট প্রথম ইনিংস), গাভাসকর বো বখত ২ (চতুর্থ টেস্ট প্রথম ইনিংস)।

১৯৭৬-এর ৩০ নভেম্বর করাচিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে সিকান্দারের প্রথম টেস্ট আবির্ভাব। দু'ইনিংসে তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন সিকান্দার। ভারতে আসার আগে পর্যন্ত তিনি ১৪টি টেস্টে ১,২৩৭ রান দিয়ে ৩৪ উইকেট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ গড়ে উইকেট প্রতি ৩৬·৩৮ রান দিয়েছিলেন। তাহলে ঐ ৩৪-এর সঙ্গে যোগ হল ২৩ (কানপুর টেস্ট পর্যন্ত)।

বলা বাহুল্য, টেস্টের হিসেবে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ প্রুডেন্সিয়াল কাপের হিসেব অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু ইংল্যান্ডে গত বছর দ্বিতীয় বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় সিকান্দারের নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। প্রুডেন্সিয়াল কাপে সিকান্দার চারটি ম্যাচে মোট ৪১ ওভার বল করে (১০ মেডেন) ১০৮ রান দিয়ে সাতটি উইকেট পেয়েছিলেন। এই সাতটি মূল্যবান উইকেটের মধ্যে ছিল হিউজ, বর্ডার, র‍্যান্ডল ও গুচের উইকেট।

হকি রসাতলে

বজ্র সেন

"মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কথা রাখতে পারলাম না। কথা দিয়েছিলাম, চ্যাম্পিয়নস কাপ ট্রফিতে ভারতের খেলার উপর একটা লেখা পাঠাব, পাক্ষিক আনন্দমেলার জন্যে। কিন্তু প্রতিযোগিতার প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে ভারত যে খেল্ দেখাচ্ছে, তাতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম যে, ভারতীয় হকি নিয়ে আর কোনও দিন কিছু লিখব না। তার চেয়ে বরং..."

এইভাবেই চিঠিটা আরম্ভ করেছিলাম। বলাবাহুল্য, গত ৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের কাছে ভারত ১-৭ গোলে হারার পরমুহূর্তেই। কিন্তু পরে ভাবলাম, না, লিখব না-ই বা কেন? আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনও তো আছে। যদি আমাদের চোখের জল শুকিয়ে আগুন হয়ে ভারতীয় হকির এই জীর্ণদশাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, এবং অভ্যুদয় ঘটায় নতুন নেতৃত্বের, তাহলেও তো জানব একটা কাজ হল।

হ্যাঁ, সত্যিই আমাদের চোখে আর জল নেই। পাকিস্তানের কাছে খাওয়া গোলের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। পাঁচ (১৯৭৬, লাহোর) থেকে ছয় (১৯৭৮, করাচি) তারপর সাত (১৯৮০, করাচি)। এরপর গাণিতিক নিয়মে ১৯৮২ সালে কোথাও আট হবে না তো? কিন্তু হলেই বা কার কী আসে যায়? এ-সব তো আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে! প্রথম প্রথম সকলের দুঃখ হত পাকিস্তানের কাছে হারলে। তারপর অনেকের হত, এখন আমার মতো কারো-কারো হয়. এরপর হয়তো কারোই হবে না। ১৯৫৬ সালে রোম অলিম্পিকে আমরা পাকিস্তানের কাছে হকিতে প্রথম হারি। আজ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ২২বার মুখোমুখি হয়েছি। এর মধ্যে ওরা জিতেছে ১৩ বার, আমরা মাত্র ছ'বার। বাকি তিনবার ড্র। মোট গোলসংখ্যা পাকিস্তানের ৩৮, ভারতের ২৪। হবে না কেন, আমরা তো কখনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটির বেশি তিনটি গোল করতে পারিনি।



অবিভক্ত ভারতের দুই বিশ্ববিখ্যাত হকি-খেলোয়াড় —ধ্যানচাঁদ ও দারা। ধ্যানচাঁদ সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। দারা এখন পাকিস্তান-হকির উপদেষ্টা ও কর্ণধার।

নিজের মনকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে লাভ নেই। পাকিস্তানের এ-সব রেকর্ড ভারত কি আর ধরতে পারবে? সবই আগের মতো চলবে। ক্রিকেট টেস্টের টিকিট নিয়ে মারামারি, কিংবা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় নিয়ে কাড়াকাড়ি। কিন্তু যা গেছে, তা আর ফিরবে না। আমাদের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। একবার নয়। বারবার।

অমনি কেউ আমাকে বাধা দিয়ে বলতে পারেন, "কেন, ভারত কি আর কোনও দিনই পাকিস্তানকে হারাতে পারবে না?" উত্তরে বলি, পাকিস্তান তো পরের কথা, ভারত আগে পশ্চিম জার্মানি, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিকে হারাক! এইসব দেশ আজকাল ভারতকে একরকম বলে বলে হারায়। একটা পাল্টা প্রশ্নও করব। আমরা কেউ কি এখন কারও বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? যাদের সঙ্গে আজ আমরা ড্র করছি, বা দু-এক গোলে জিতছি, যেমন নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, মালয়েশিয়া, কিনিয়া, স্পেন, এরপর তারাও আমাদের হারাতে শুরু করবে! আর কি ভারতকে কেউ ভয় করে? মনে হয়, না।

আসল কথা হল আমরা সেই এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি, আর পৃথিবীর

অন্যান্য দেশ বহু এগিয়ে গেছে। আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করিনি। অথচ বিপদসঙ্কেত তো ১৯৫৬ সাল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। মেলবোর্নে পঃ জার্মানি ও পাকিস্তানকে ১-০ গোলে হারিয়ে আমাদের মান বেঁচেছিল কোনও রকমে। তখন থেকেই ভয় পাওয়া ও মানোন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বোকার মতো আমাদের ধারণা ছিল, হকিতে আমাদের কেউ কোনওদিন হারাতে পারবে না। ফল হাতে- হাতেই পেলাম। ১৯৬০ সালে। না, ভুল লিখলাম। ১৯৬০ সাল থেকেই পাচ্ছি। মধ্যে ১৯৬৪ সালে অলিম্পিক সোনা ও ১৯৬৬ সালে এশিয়ান গেমস্-এর সোনার কথা বাদ দিলে আমরা এখন তৃতীয় সারিতে। এই লেখার সময় পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে ভারত ছটি খেলায় তিনটি হেরে দুটি ড্র করে মাত্র একটিতে জিতেছে।

এক-এক সময়ে সন্দেহ হয়, ভারতীয় হকি কি তার শেষ অবস্থায় এসে গেছে? আর সেইজন্যেই কি খেলোয়াড়রা একটা নির্দিষ্ট মানের উপরে আর কিছুতেই উঠতে পারছেন না? কে জানে। আর, অ্যাসট্রো-টার্ফ-এর অজুহাত দেখিয়ে লাভ কী? এখন হকি খেলতে হ'লে অ্যাসট্রো-টার্ফেই খেলতে হবে, কাজেই তাতে অনুশীলনও করতে হবে। পাকিস্তানের মতো ছোট্ট দেশ যদি তার ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না? কিন্তু আমাদের হতভাগ্য খেলোয়াড়রা এ-দেশে অ্যাসট্রো-টার্ফে খেলবার সুযোগ পায় না। শেষ খবরে জানা গেল, সেই সুযোগের জন্য আমরা এখন পাকিস্তানের কাছে ধর্না দিয়েছি!

তাহলে কী হবে? কোনও আশার আলো কি দেখা যাচ্ছে না? অপ্রিয় হলেও সত্যি উত্তরটা হল—না। অন্তত, বর্তমান কাঠামোয় নয়। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, কিষেণলাল, বাবু, বলবীরের ভারতীয় হকি আজ কাদায় পড়েছে. উঠতে পারছে না। ধ্যানচাঁদের অসীম সুকৃতি, ভারতীয় হকির বর্তমান অবমাননা বা বৃহত্তর কিছু অসহায়ভাবে দেখার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

॥ কলকাতার কোথায় কি হচ্ছে ॥

কলকাতার কোথায় কোন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে সেসব জান তো? আমি অবশ্য বড় বড় কাজের কথা বলছি। যেমন ধর বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে যে নতুন উপনগরী তৈরীর কাজ চলছে তার কথা।

বি. বা. দী বাগ থেকে পনেরো কিঃ মিঃ (দক্ষিণ পূর্বে) দূরে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে একটা নতুন উপনগরী তৈরী হচ্ছে। ৩৭৬ একর জমিতে ৩০ হাজার লোক এখানে থাকতে পারবে। ১৯৮২ সাল নাগাদ কাজ শেষ হবে।

এখানে বিশেষ করে গরীব মানুষেরা বাড়ী তৈরীর জন্য জমি কিনতে পাবেন। আর থাকবে ব্যবসাকেন্দ্র, পার্ক, খেলাধুলোর মাঠ, বাজার, স্কুল, হাসপাতাল, দমকল সব কিছু। এছাড়াও নর্দমা, জলসরবরাহ, রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সবই থাকবে। ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাস নামে একটা রাস্তা সল্টলেক থেকে এর ভিতর দিয়ে গড়িয়ার দিকে চলে যাবে।

কসবার পেছনে পূর্ব্ব কলকাতায় এমনি আর একটা উপ-শহর গড়ে উঠবে। তেমনি হাওড়ার কোণাতেও উপনগরী তৈরীর পরিকল্পনা আছে। এগুলিতেও থাকবার জায়গা ছাড়া, রাস্তা-ঘাট, জল, নর্দমা, বিজলী ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত থাকছে।

এছাড়া আরও বড় বড় কাজ হচ্ছে। যেমন বস্তী উন্নয়ন, জলসরবরাহ, চওড়া চওড়া রাস্তা তৈরী, পরিবহন, পোলালা আরও কত কি। পরের বার সে সব কথা বলবো।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি,এম,ডি,এ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

আবার বাবার

অলোক দাশগুপ্ত

পঞ্চম টেস্ট শুরু হওয়ার আগে শেষবারের মতো চীপকের উইকেট পর্যবেক্ষণ করলেন অধিনায়ক গাভাসকার। তারপর প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের নামের তালিকা তুলে দিলেন আম্পায়ারের হাতে।

হায়দরাবাদের অফ-স্পিনার শিবলাল যাদবের জায়গায় বোম্বাইয়ের মারকুটে ব্যাটসম্যান সন্দীপ পাতিলের অন্তর্ভুক্তিতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ, যাদব বাদ পড়ায় দলে নিয়মিত স্পিনার বলতে রইলেন মোটে একজন—বাঁ-হাতি দিলীপ দোশি। অতএব আক্রমণের এই 'সীমিত' রসদ নিয়ে ভারত কি পারবে পাকিস্তানের নামী ব্যাটসম্যানদের রুখে দিতে?

টেস্টের ফলাফল প্রমাণ করে, গাভাসকার সুচিন্তিত কাজ করেছিলেন। ওঁর মূল লক্ষ্য ছিল, ভারত যেন কোনো অবস্থাতেই পঞ্চম টেস্ট না হারে। চীপক উইকেট দেখে গাভাসকার টের পেয়েছিলেন, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাট করতে পারলে ওখানে লম্বা ইনিংস গড়া অসম্ভব নয়। তিনি চেয়েছিলেন ব্যাটিংয়ের উপর বেশি জোর দিতে। পাতিল এসে ভারতীয় ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংকে বেশ মজবুত করেছিলেন।

গাভাসকার জানতেন, তাঁর দলে এমন একজন খেলোয়াড় আছেন যিনি যে-কোনো মুহূর্তে ব্যাটে - বলে সংহার - মূর্তি ধারণ করতে পারেন। তাঁর নাম কপিলদেব। ক্রিকেট হল গোটা দলের। কিন্তু, মাঝে-মধ্যে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে।

মাদ্রাজের চিদম্বরম স্টেডিয়ামে যে-খেলা কপিল খেললেন, তার তুলনা তিনি নিজেই। অল্প রানে চার সেরা পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান —সাদিক মহম্মদ, মুদাস্সর নজর, জাহির আব্বাস এবং জাভেদ মিয়াঁদাদকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন কপিল। ভারতের যখন বড় রানের 'লীড' দরকার, তখন ব্যাট করতে এসে ৮৪ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস উপহার দিলেন দর্শকদের। তবে তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব দ্বিতীয়



কিরমানির দুর্দান্ত ক্যাচে মুদাস্সর আউট

গাভাসকার অভিনন্দন জানাচ্ছেন কিরমানিকে









মুদাসসরের বল গাভাসকার বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছেন

ইনিংসের বোলিংয়ে। মাত্র ৫৬ রানে সাত উইকেট। এত ভাল বোলিং এর আগে অন্য কোনো ভারতীয় পেস বোলারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। টেস্টে একহাজার রান এবং একশো উইকেটের জন্য কপিলের দরকার আর মোটে ২৩ রান এবং দুটি উইকেট। ইডেনে কপিল সেই লক্ষ্যে কখন পৌঁছবেন, তা দেখার জন্যে কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

অধিনায়ক গাভাসকারের ১৬৬ রানের কেতাবি ইনিংসটি চীপকের দর্শকরা বহুকাল মনে রেখে দেবেন। এই সিরিজে দু-দু'বার উনি সেঞ্চুরির মুখে এসে আউট হয়ে গেছেন। অতএব তেইশ নম্বর শতরানটি গাভাসকার কোন্ মাঠে করবেন—তা নিয়ে জল্পনার শেষ ছিল না। চীপকে গাভাসকার কখনও সফল হননি, এগারোটি ইনিংসে ও'র সেরা স্কোর ছিল পঞ্চাশ। কিন্তু এবারের ব্যাটিং তাঁর সব ব্যর্থতা মুছে দিয়েছে। প্রায় দশঘণ্টা উইকেটে থেকে গাভাসকার একটির পর একটি রেকর্ড শুধু গড়েননি, সঙ্গে সঙ্গে যশপাল, কপিলদেবকে অনুপ্রাণিত করেছেন দায়িত্বশীলের মতো ব্যাট করতে। ইমরানের অফ-স্টাম্পের বাইরে প্রলুব্ধ করা একটি বলকে স্কোয়ার কাট করতে গিয়ে কাসিমের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন গাভাসকার তখন সারা মাঠ একসঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাকে। কিন্তু গাভাসকার নিজের ভুলের জন্যে ধিক্কার দিয়েছিলেন নিজেকে। ঐ সামান্য ভুলটি না করলে চীপকে হয়ত দুশো রান করতে পারতেন গাভাসকার।

ভারতের জয়ে অন্যান্য খেলোয়াড়দের ভূমিকাও কম নয়। প্রথম ইনিংসে উইকেটরক্ষক কিরমানি যে চারটি ক্যাচ নিয়েছেন, তার মধ্যে দুটি ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। যশপালের লড়িয়ে ৪৬, রজার বিনির আক্রমণাত্মক নট-আউট ৪২ এবং দোশির টাইট বোলিং দলকে জয়ের পথে নিয়ে গেছে।

পঞ্চম টেস্টে বল-ব্যাট-ফিল্ডিং—সবদিক থেকেই পাকিস্তান ভারতের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। বোম্বাই টেস্টে হারের পর পাক অধিনায়ক আসিফ ইকবাল পিচ এবং আম্পায়ারিংয়ের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। এবার আসিফ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, চীপক উইকেট ভারতের সেরা। আম্পায়ারিং সম্পর্কেও তেমন কোনো অভিযোগ ওঠেনি। যদিও মাদ্রাজে প্রথম ইনিংসে মজিদ ভালই ব্যাট করেছেন, তবু বলা যায়, এই সিরিজে তিনি, জাহির, সাদিক, মুদাসসর এবং আসিফ তেমন সুবিধে করতে পারছেন না। অনেকেই বলাবলি করছেন যে, পাকিস্তানের সুপারস্টারদের সেরা সময় হয়ত পার হয়ে গেছে।

পাকিস্তান ব্যাটিং এখন প্রধানত দুজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভরশীল। ওয়াসিম রাজা (৫৭) এবং জাভেদ মিয়াঁদাদ (৫২) যদি দ্বিতীয় ইনিংসে লড়িয়ে মেজাজের পরিচয় না দিতেন তা হলে এই টেস্টে পাকিস্তানকে ইনিংসে হারতে হত।

কলকাতা টেস্টে সাদিক, মুদাসসর বা জাহিরের বদলে যদি মহসিন খাঁ দলে স্থান পান, অবাক হওয়ার কিছু নেই, তবে পাকিস্তানের পক্ষে আশার কথা এই যে, ইমরান সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মাদ্রাজ টেস্টে ও'র পাঁচ উইকেট ভাল বোলিংয়ের ফসল।

নতুন বছরের শুরুতে একটি ব্রিটিশ মাসিক পত্রিকা— 'উইজডেন' মন্তব্য করেছিল—আশির দশকে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করবে। চীপকে ভারতের রাবার জয় যদি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর কোনো ইঙ্গিত দেয়, তবে বলা যেতে পারে, আমাদের আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

টুকাই ও উঁচু বাড়ি

বিকাশ বসু

বড়মামার হাত ধরে আঠারোতলা বাড়ির ছাতে উঠে টুকাইয়ের মনে হল—ওফ্, পাখিরা কী ভাগ্যবান! আসছে জন্মে সে ঠিক পাখি হয়ে জন্মাবে। এত উঁচু থেকে গড়ের মাঠকে সুন্দর দেখায়। ঠিক যেন এক সবুজ রঙের গালচে পাতা রয়েছে।

গড়ের মাঠে তো সে এর আগেও কতবার বেড়াতে এসেছে। কিন্তু গড়ের মাঠের সঙ্গে যে তার এভাবে দেখা হবে তা কি সে ভাবতে পেরেছিল কখনও। একটা সবুজ গালচে কে যেন এইমাত্র বিছিয়ে দিয়ে গেছে তার চোখের সামনে। কিংবা রুমাদির হাতে বোনা একখানা আসন, উজ্জ্বল সবুজ রঙের জমি, আর ঐ যে রুপোলি পাড়? ওটা কী? "ওটাই বোধহয় মা-গঙ্গা, না বড়মামা?"

বড়মামাও বোধহয় টুকাইয়ের মতো মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন কলকাতার এই আশ্চর্য রূপ। তিনি শুধু ছোট্ট করে বললেন, "হুঁ।"

টুকাইয়ের আবার মনে হল, ওফ্, পাখিরা কী ভাগ্যবান। এমন আশ্চর্য দৃশ্য পাখিরা সব সময় দেখতে পায়। শুধু দুটো ডানা মেলে দিলেই হল। আসছে-জন্মে সে ঠিক পাখি হয়ে জন্মাবে।

এই সময় গাঁ-গাঁ শব্দে একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল তাদের মাথার ওপর দিয়ে। টুকাই ভাবল, আরে আমি কী বোকা। পাখি না হয়ে এরোপ্লেনের পাইলট হলেই তো হয়। ওপর থেকে নীচের দৃশ্য দেখা, তার জন্যে শুধু-শুধু পাখি হতে যাব কেন? এরোপ্লেনের পাইলট হলেই তো হয়। তবে একটা কথা। এরোপ্লেন যা জোরে যায়, পাইলট কি সব কিছু দেখার সুযোগ পায়! তার মনে হল বড়মামাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়, পাইলটরা নীচের সব দৃশ্যটৃশ্য ঠিকমত দেখতে পায় কি না। কিন্তু বড়মামা ততক্ষণে তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এরকম সময় বিরক্ত করলে বড়মামা ভয়ানক খেপে যান।

টুকাই নীচের দিকে তাকাল, ট্রাম-বাস চলেছে যেন খেলনা গাড়ি। সে ভেবে দেখল, না, এমন দৃশ্য দেখতে হলে এরোপ্লেনের



পাইলট হলে চলবে না, তাকে হেলিকপটারের পাইলট হতে হবে। কিন্তু সেও তো আর এ জন্মে হচ্ছে না। এ জন্মে সে কি হবে, তা যে আগেই ঠিক করা হয়ে গেছে। সে বড় হয়ে বড়মামার মতই মস্ত এক ফোটোগ্রাফার হবে।

গত বছর বড়মামা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রাইজটা নেওয়ার সময় টুকাই ঠিক করে ফেলেছে ফোটোগ্রাফার তাকে হতেই হবে। ফোটোগ্রাফার না হলে জীবনই বৃথা। যাকগে, আসছে জন্মে সে ঠিক হেলিকপটারের পাইলট হবে।

নীচের দিকে তাকিয়ে যত দেখছে, টুকাইয়ের মন ভরে যাচ্ছে এক অদ্ভুত আনন্দে। চৌরঙ্গি রোড দিয়ে কত গাড়ি, বাস মিনিবাস দোতলা বাস ট্রাম লরি টেম্পো চলেছে—সব যেন খেলনা গাড়ি। টুকাই আবার ভাবতে



শুরু করল—আসছে-জন্ম পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতেই হয় তাহলে হেলিকপটারের পাইলট কেন, একেবারে পাখি হতেই বা দোষ কি।

আসছে-বারে প্রথমে সে জন্মাবে, তারপর বড় হবে, তারপর তো পাইলট। পাইলট হতে গেলে আবার অঙ্কটঙ্ক কষতে হয়, সে বড় ঝামেলা। তারচেয়ে সরাসরি পাখি হয়ে জন্মালেই তো ভাল। অঙ্কটঙ্ক কিচ্ছুটি করতে হবে না, শুধু ডানা দুটি মেলে দিলেই হল—দৃশ্য, দৃশ্য প্রাণভরানো সব দৃশ্য। আসছে-জন্মে সে অহলে পাখি হয়েই জন্মাবে।

বড়মামা তাঁর ক্যামেরা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে পুরতেই সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বড়মামা, কোন্ পাখি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে ?''

কথার সঙ্গে হাসি মিশিয়ে বড়মামা বললেন, "কেন রে, হঠাৎ পাখির কথা মনে হল যে বড়। উঁচুতে উঠলেই বুঝি পাখির কথা মনে হয় তোদের ?"

টুকাই বড়দের ঢঙে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল, "না না, এই এমনি বলছিলাম আর কি।''

বড়মামা বললেন, "তোর আবার পাখি পোষার শখ হল কবে থেকে।"

বড়মামার কথায় টুকাইয়ের মাথায় বজ্রাঘাত হল। এইরে, এই সাধারণ কথাটা তো সে একবারও ভেবে দেখেনি। সে যে আসছে জন্মে পাখি হয়ে জন্মাবে, কেউ যদি তাকে খাঁচায় পোরে। তাহলে যে তার উড়ে-উড়ে গড়ের মাঠের দৃশ্য দেখা বেরিয়ে যাবে। কেউ কেন, দে-সরকারকাকু রয়েছে কী করতে। দে-সরকারকাকুই তো তাকে খপ করে ধরে খাঁচায় পুরে দেবে।

পাখি পোষা দে-সরকারকাকুর এক বাতিক। বাড়িটা করে রেখেছে যেন মিনি চিড়িয়াখানা। দুনিয়ার যাবতীয় পাখি, ময়না থেকে হাঁড়িচাচা, সব পাখি পুষেছে, সব নাম মনে রাখা যায় না। কাঠঠোকরা পাখির জন্যে মরা গাছের একটা আস্ত গুঁড়ি পর্যন্ত বসিয়েছে উঠোনের মধ্যিখানে। টুকাই যদি পাখি হয়ে জন্মায় তাকে কি আর ছেড়ে দেবে ? টুকাই ঠিক করল, যদি সে আসছে জন্মে পাখি হয়ে জন্মায়ও দে-সরকারকাকুদের মতো লোককে একেবারে এড়িয়ে চলবে।

দে-সরকারকাকুকে না-হয় এড়ানো গেল কিন্তু তার ছেলে গোগো? তার গুলতি এবং তার হাতের নিশানা অব্যর্থ। একবার তো একটা উড়ন্ত গোলা পায়রাকেই গুলতির এক গুলিতে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। তাহলে তো আসছে-জন্মে গোগোর বন্ধুত্বও তাকে ছাড়তে হবে।

বড়মামা এবার তার হাত ধরে টানল, "নে চল, আর কতক্ষণ থাকবি।"

টুকাই বলল, "বড়মামা আর একটু থাকি।''

আসলে তার সেখান থেকে নেমে আসতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এত উঁচু থেকে কলকাতা একেবারে পালটে গেছে—কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, ধুলোকাদা নেই, সব একেবারে ঝকঝকে তকতকে।

বড়মামা আবার তাড়া দিলেন, "নে, চল চল।"

টুকাই বলল, "আর একদিন আসতে হবে কিন্তু।"

বড়মামা বললেন, "হবে হবে।"

এই শর্তেই টুকাই লিফটে করে শোঁ শোঁ নীচে নেমে এল। যতক্ষণ আঠারোতলা বাড়ির ছাদের ওপর ছিল, সে নীচের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এইবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নীচে থেকে ওপরের দিকে তার তাকাতে ইচ্ছে হল। কী উঁচু বিল্ডিং রে বাবা—ঘাড় বেঁকে যায় তাকাতে গেলে। ছাতের ঠিক কোন জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল ? কিছুই বোঝা গেল না, দেখা গেল না—কিন্তু ওমা, ইলেকট্রিকের তারে বেঁধে ওটা কী ঝুলছে! একটা মরা পাখি। একটি পা তারের সঙ্গে জোড়া, বাকি সমস্ত দেহটা মাথাটা নীচের দিকে। এ কী ভয়ানক দৃশ্য দেখল সে। না আসছে-জন্মে সে কিছুতেই পাখি হয়ে জন্মাতে পারবে না। তার চেয়ে হেলিকপটারের পাইলটই সে হবে। একটু আধটু অঙ্ক যদি শিখতেই হয় তো শিখে নেবে। অঙ্কে যে সে একেবারে কাঁচা তা তো নয়। ও ঠিক হয়ে যাবে একরকম করে। তা-ছাড়া দে-সরকারকাকুদের বাড়িতেও যাতায়াত করতে পারবে গোগোর সঙ্গে বন্ধুত্বও বজায় থাকবে। পাখি-পাখি করে কী সব যা-তা ভাবছিল এতক্ষণ। পাখি হওয়ার অনেক ঝামেলা, আসছে-জন্মে সে পাইলটই হবে।

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত

ব্রহ্মপুত্র

দিদিমণি

উৎস থেকে পদ্মা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের দূরত্ব ১,৮০০ মাইল বা ২,৯০০ কিলোমিটার। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার মিলিত প্রবাহ বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উৎস মানস সরোবরের কাছে চেমা-ইয়ুংডুং হিমবাহ। তিব্বত, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম হয়ে এই নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তিব্বতে এর নাম সাংপো, অরুণাচলে ডিহং, আসামে ব্রহ্মপুত্র এবং বাংলাদেশে যমুনা।

উৎসের তিনটি নদীর নাম হল—কুবি, আংসি ও চেমা-ইয়ুংডুং। এই তিনটি নদী মিশে সাংপো নদী সৃষ্টি করেছে। সাংপো কথাটির মানে হল—যে পবিত্র করে। সাংপো তিব্বতে ৭০০ মাইল ধরে পূর্ব দিকে বয়ে গেছে। এর দক্ষিণে হিমালয় এবং উত্তরে নিয়েন চিং-টাং কু-লা শান পর্বত-শ্রেণী।

আসাম উপত্যকায় সদিয়া শহরে ডিহং দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে গেছে এবং লোহিত ও ডিবং নদীর সঙ্গে মিশেছে। এই নদীগুলির সঙ্গে মেশবার পর থেকে প্রায় ন'শো মাইল এই নদী ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। আসাম উপত্যকায় সাড়ে-চারশো মাইল প্রবাহের মধ্যে হিমালয় অঞ্চল থেকে অনেক পার্বত্য নদী ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। এইগুলির নাম হল—সুবনসিরি, ভারেলি, ধানসিঁড়ি, মানস, চম্পাবতী, সরলভাঙা, এবং সঙ্কোশ। দক্ষিণ দিকের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এসে মিশেছে বুড়িডিহং, দিসাং, দিখু এবং কাপিলি।

গারো পাহাড়কে ঘিরে বয়ে গিয়ে ধুবড়ির পরে দক্ষিণ-দিকে বেঁকে গিয়ে এই নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরে এসে মিশেছে তিস্তা নদী। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন শাখা গাইবাঁধার পর বাঁ তীর থেকে আলাদা হয়ে জামালপুর এবং মৈমনসিংহের পরে ভৈরব-বাজারে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিশেছে। পদ্মার সঙ্গে মেশার আগে অনেক নদী যমুনা নদীতে এসে মিশেছে। এর পরে যমুনার একটি ধারা



ধলেশ্বরী নামে নদীর বাঁ তীর থেকে বেরিয়ে আলাদাভাবে বয়ে গেছে। ধলেশ্বরীর একটি শাখা বুড়িগঙ্গা নামে ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে মুনশিগঞ্জে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। গোয়ালন্দ ঘাটের উত্তরে পদ্মার সঙ্গে যমুনা মিশেছে। তারপরে আরও কিছু মাইল দক্ষিণে বয়ে যাওয়ার পরে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিশে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

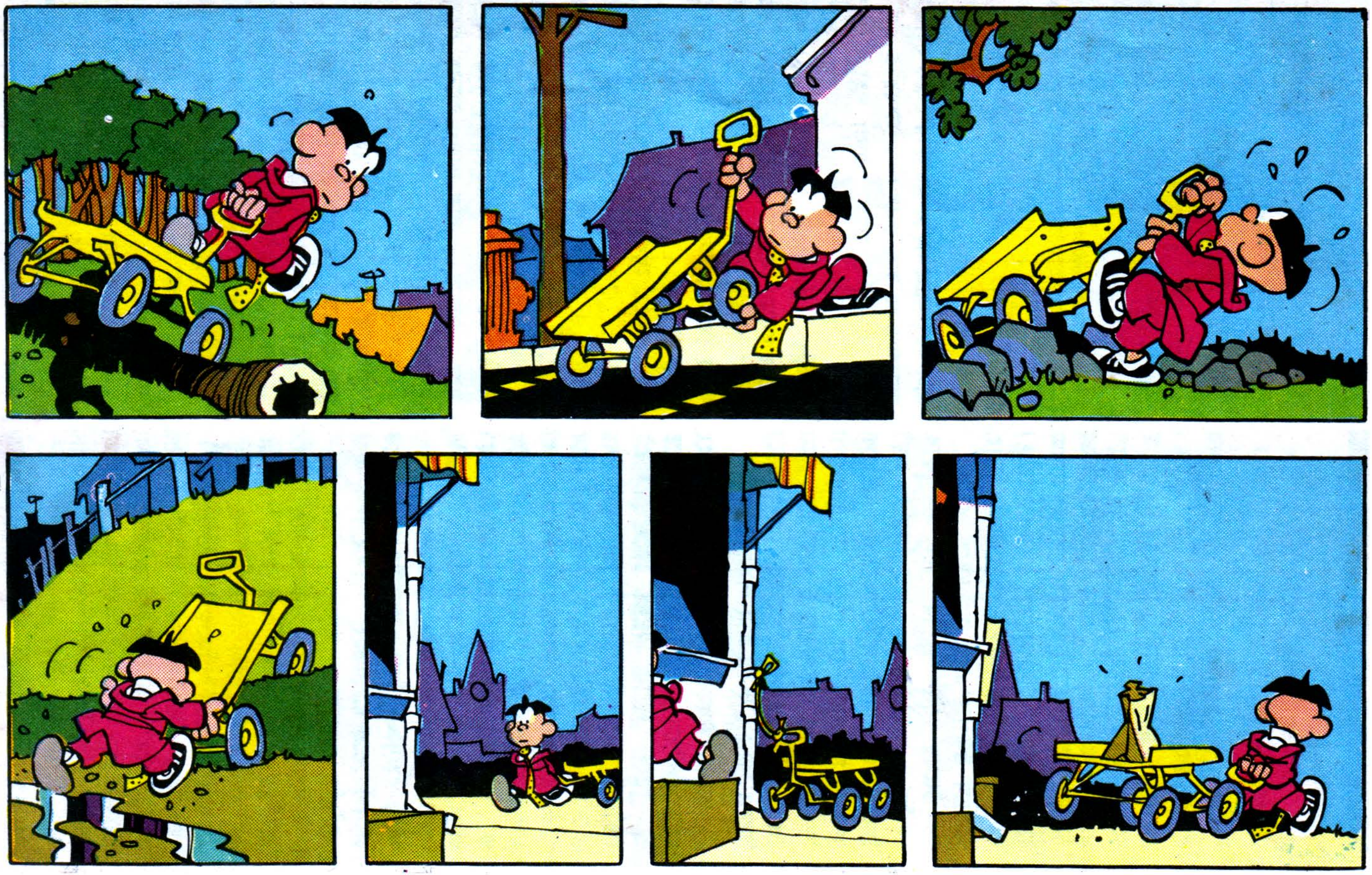
তিব্বতে যেখানে ব্রহ্মপুত্র সাংপো নামে পরিচিত সেখানকার জলবায়ু খুব শীতল। ভারতে ও বাংলাদেশে এই নদের উপত্যকায় মৌসুমী জলবায়ু।

আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শালগাছের বন দেখতে পাওয়া যায়। জলাভূমিতে বড়-বড় ঘাস জন্মায়। বাঁশ-ঝাড়ও অনেক আছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জলাভূমির সবচেয়ে বিখ্যাত জন্তু হল এক-শৃঙ্গী গণ্ডার, যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। জঙ্গলে বাঘ ও হাতি আছে। ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

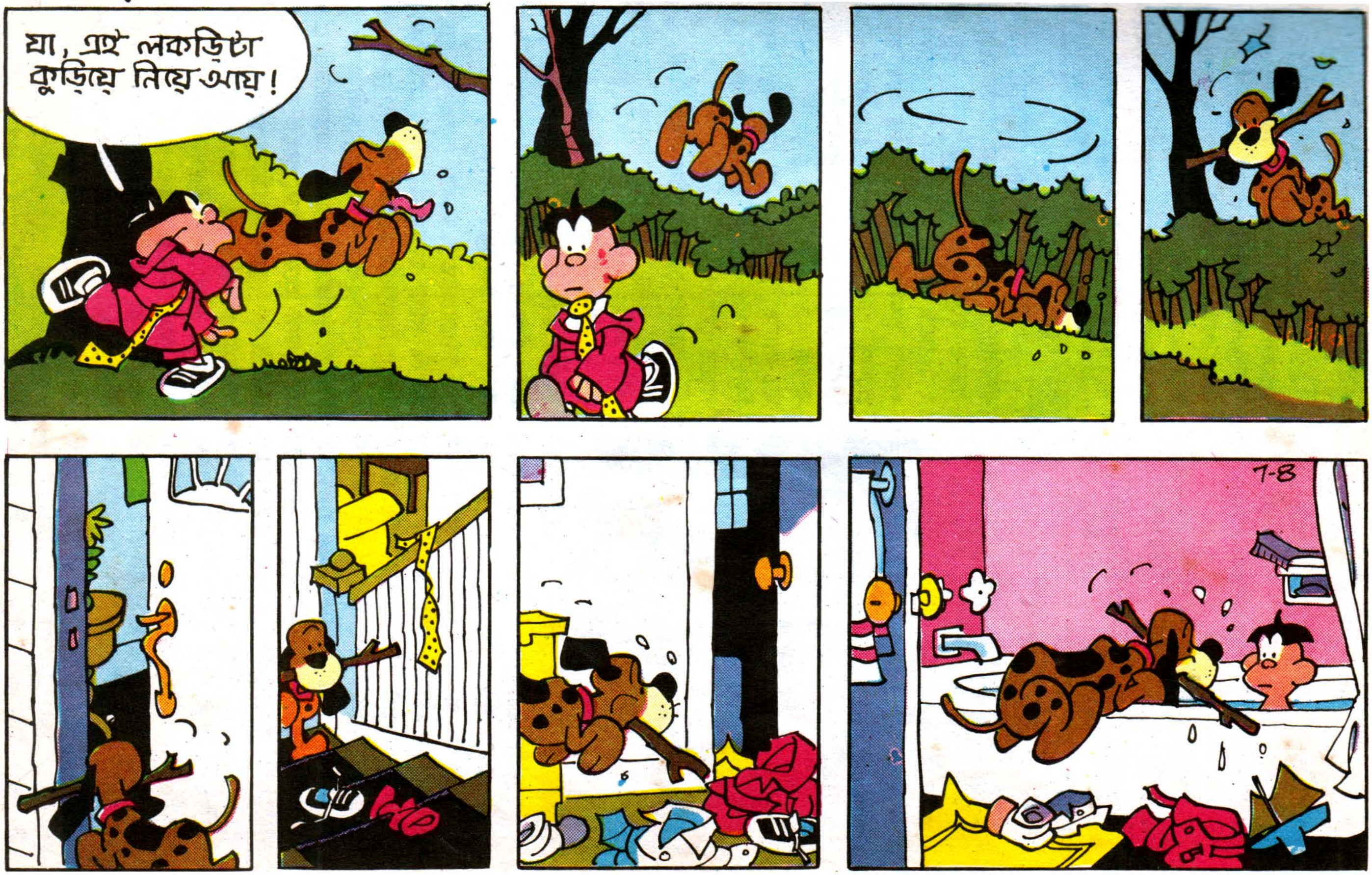
ব্রহ্মপুত্র প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করে। প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করার জন্যে নদীর মধ্যে অনেক চরের সৃষ্টি হয়েছে। বহু ভাষাভাষী লোক এই নদের দুই তীরে বাস করে।

ব্রহ্মপুত্র নদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের মূলে আছে আসামের চা-বাগান, জঙ্গলের কাঠ, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বাংলাদেশের পাট।

বাঘা ১



বাঘা ২



হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষিকা কী বলেন

কলকাতায় এক নম্বর অভেদানন্দ রোডের হোলি চাইল্ড ইন্সটিটিউট পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর বালিকা বিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বহুবার। ম্যাট্রিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক—সব পরীক্ষাতেই এই স্কুলের মেয়েরা স্ট্যান্ড করেছে। মেয়েদের



মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থানটি দখল করেছে এই স্কুল। প্রত্যেক বছর ন্যাশনাল স্কলার-শিপ পায় দশ-বারোজন ছাত্রী। স্কুলে প্রথম বিভাগের ছড়াছড়ি। এবং লেটারের। মাধ্যমিক পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। ৬৪ জনকে পাঠানো হয়েছিল, ৫১ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। অথচ, কতই বা বয়স স্কুলটির!

মাত্র গত বছরে রজতজয়ন্তী হয়েছে। স্কুল স্থাপিত (১৯৩৮) হওয়ার এক বছর পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সিস্টার্স অব চ্যারিটি সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ভাড়া বাড়ি থেকে হেদুয়ার পেছনে বর্তমান বাড়িতে চলে আসে ১৯৫৩ সালে।

তিন বছর আগে সিস্টার রোমানা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান-শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে বারো বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। ও'র বিষয় পদার্থবিদ্যা। বললেন, "মেয়েদের পরীক্ষা পাস করানো বা ভাল নম্বর পাইয়ে দেওয়াটাই ও'দের স্কুলের প্রধান লক্ষ্য নয়। প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তাদের চরিত্র এমনভাবে গঠন করা যাতে তারা সমাজের ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে।"

"পরীক্ষার ফল ভাল করতে হলে কী-কী করা দরকার?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সিস্টার রোমানা বললেন, "গোটা সিলেবাসটাকেই ভালভাবে পড়তে হবে। বেছে বেছে পড়ার দিন শেষ হয়ে গেছে এখন। আজকাল অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়, তাই নানা রকমের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ও-ছাড়া আর উপায় নেই। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের বইটাই ভালভাবে পড়া উচিত। তবে ভাল ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজন ওতে মেটে না। স্কুলের নির্দিষ্ট বই ছাড়াও বাইরের বই তাদের পড়তে হবে।"

বললাম, "এ তো গেল পড়ার দিক। উত্তর লেখার সময় কী-কী নিয়ম মেনে চলা উচিত?"

"পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। উত্তরের ভাষা যেন ঠিক হয়। বাক্য-রচনা যেন ঠিক হয়।

"ইংরেজিতে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ করেই ভাল নম্বর পেয়ে যায়, নিজস্ব ভাষায় লিখলে নম্বর কম পায়। কিন্তু এতে ভাষা শেখা হয় না। গ্রামার ভাল করে না পড়লে নম্বর উঠবে না। বাংলাতেও টেক্সট বই ভাল করে পড়তে হবে। বানান ভুল এড়াতে হবে। ব্যাকরণ-ভীতি জয় করে ভাষার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। বাইরের ভাল-ভাল বই পড়ে এবং সহায়ক-বই পড়ে নিজের ভাষা ভাল করতে হবে। অঙ্ক যত অভ্যাস করবে ততই ভাল হবে। ফিজিক্যাল সায়েন্স বুঝতে চেষ্টা করে ভালভাবে পড়তে হবে—না বুঝে শুধু মুখস্থ করলেই চলবে না। লাইফ-সায়েন্সে বেশ কিছু মুখস্থ রাখা দরকার, ভাল চর্চা করাও দরকার—ছবি এ'কে

এ'কে পড়তে হবে। উত্তরে প্রয়োজন অনুসারে ছবি আঁকলে ভাল হয়। ইতিহাসেও কিছু-কিছু অংশ মুখস্থ করা দরকার। ভূগোলে ম্যাপের সাহায্যে পড়া উচিত এবং ম্যাপ আঁকাও অভ্যাস করতে হবে। সংস্কৃতেও ব্যাকরণ প্রচুর অনুশীলন করা দরকার।"

কর্মশিক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সিস্টার রোমানা বললেন, "কর্মশিক্ষার জিনিসগুলো নিজের হাতে সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে করা দরকার। ছাত্রছাত্রীরা যে প্রোজেক্ট করছে সে বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা দরকার। জিনিসের মূল্যায়ন, গঠন, উপাদান সব-কিছুই ভালভাবে জানতে হবে। শারীরশিক্ষার জন্যে নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা দরকার। কর্মশিক্ষা ও শারীর-শিক্ষার খাতা পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে তৈরি করতে হবে।"

সিস্টার রোমানার মতে আনন্দমেলা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পত্রিকা। এটি তাঁর স্কুলের মেয়েদের খুব প্রিয়।

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

হোলি চাইল্ড ইন্সটিটিউটের দশম শ্রেণীর ফার্স্ট গার্ল সুতপা সাহা। বাড়ি বি টি রোডে। সুতপা ছ'বছর ধরে হোলি চাইল্ডে পড়ছে। ও প্রি-টেস্ট ও টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে—এর আগে ক্লাসে সেকেন্ড হত। দূর্বা ব্যানার্জি ফার্স্ট হ'ত আগে।

সুতপা সকালে আড়াই ঘন্টা পড়ে। দুপুরে দু' ঘন্টা ধরে অঙ্ক ও লেখার কাজ করে। রাত্রিবেলা পড়ে ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। স্কুল থাকলে অবশ্য অত বেশি পড়ার সময় পাওয়া যেত না। পড়ার চেয়ে লেখার অভ্যাসটাই এখন বেশি করার চেষ্টা করছে সুতপা। স্কুলের দিদিমণিরা ওর লেখা দেখে দেন। বাড়িতে মাস্টারমশাইও লেখা দেখে দেন। মা-বাবা পড়াশোনার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেন।

সুতপার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে ফিজিক্স ও গণিত। স্কুলে প্রতিটি বিষয়েই একটা করে নির্বাচিত বই আছে এবং একটা করে অতিরিক্ত বইও পড়ানো হয়। তাছাড়া বাইরের দু-তিনখানা করে বই প্রতি বিষয়েই পড়ে সুতপা। যেমন ফিজিক্যাল সায়েন্সে—সমর গুহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুখেন্দু মাইতি, দেবব্রত বসু এবং পুরনো হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাসের বই। লাইফ সায়েন্সে পড়ে কুন্ডু-দাশ-কুন্ডু, কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল এবং টি এন সেনের বই। গণিত—স্কুলে কে সি নাগের বই পড়ানো হয়—এছাড়াও দাশ-মুখার্জি, গাঙ্গুলি-মুখার্জি ও পুরনো দু' একটা বই থেকে অঙ্ক কষে সুতপা। টেস্ট-



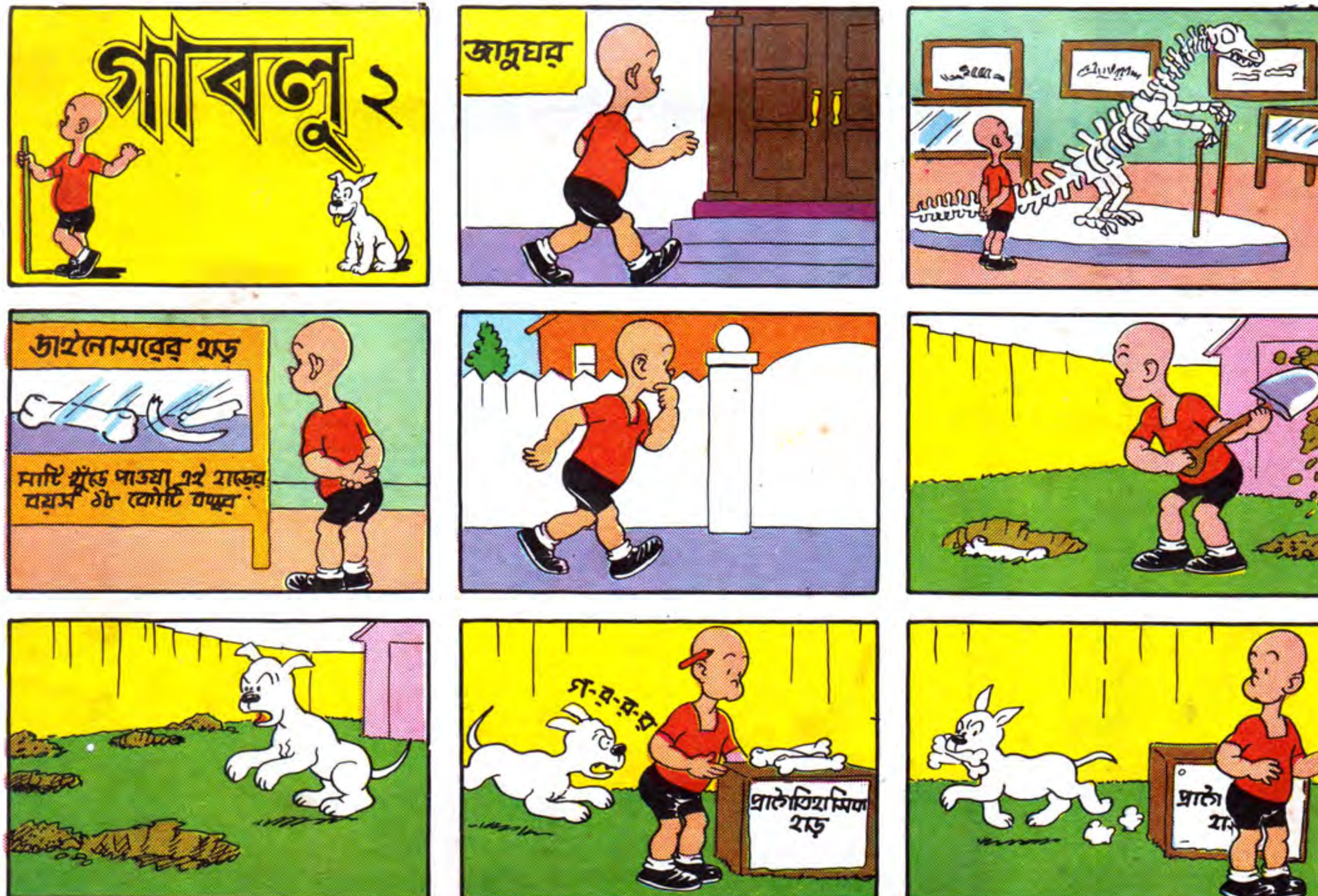
পেপার তো আছেই। ইংরেজি-বাংলায় পাঠ্য-বই ভাল করে পড়ে নিয়ে প্রশ্নোত্তর লিখে অভ্যাস করে সে। সংস্কৃতে 'হেল্পস টু দ্য স্টাডি' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। ইতিহাসে স্কুলে পড়ানো হয় অরুণ সেনের বই। সুতপা আরও পড়ে কিরণ চৌধুরী ও অতুল রায়। ভূগোলে লোকেশ চক্রবর্তীর বই স্কুলে পড়ানো হয়। কয়েকটা প্রশ্নোত্তরের বইও সে পড়ে। অ্যাডিশনাল ম্যাথমেটিক্সে কে সি নাগের বই থেকে অঙ্ক কষে।

পনেরো বছরের সুতপা ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়, অবশ্য বাড়ির সকলের ইচ্ছে সুতপা ডাক্তার হোক।

সুতপা নিয়মিত আনন্দমেলা পড়ে। আনন্দমেলার গ্রাহিকা। লেখাপড়া ও কমিকসের অংশ ওর খুব ভাল লাগে। হেড এগজামিনারের পরামর্শ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে সুতপা, বুঝতে পেরেছে পরীক্ষার উত্তর কী-ভাবে লেখা উচিত।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

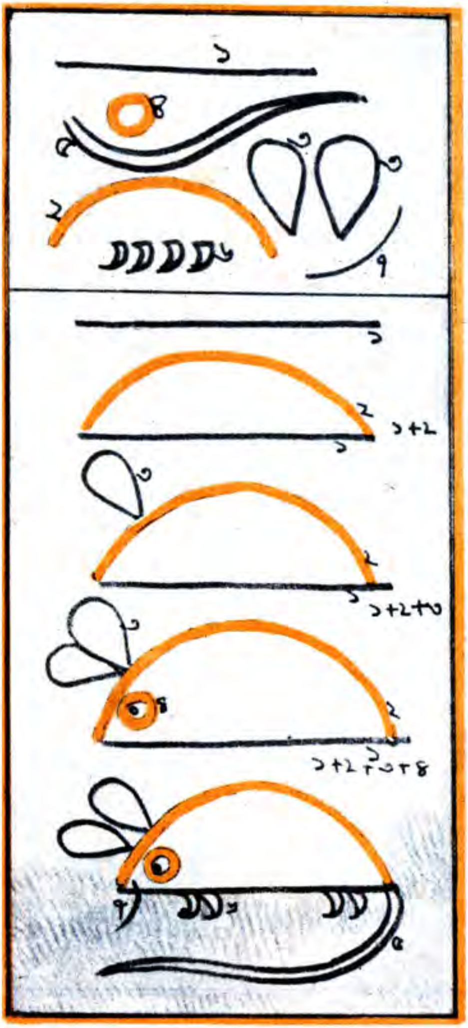

গাবলু ১
সস্তায় ফুটো ডিঙি
সস্তায় ফুটো ডিঙি
সস্তায় ফুটো ডিঙি
সস্তায় ফুটো ডিঙি
বিচ্ছিরি রকমের ফুটো!


গাবলু ২
জাদুঘর
ডাইনোসরের হাড়
মাটি খুঁড়ে পাওয়া এই হাড়ের বয়স ১৮ কোটি বছর
গ-র-র-র
প্রাগৈতিহাসিক হাড়

জন্তু-জানোয়ার—১

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিক-ওদিক করে সাতটা আকার দেওয়া আছে। তাকে পরপর সাজিয়ে কী পেলে দেখতেই পাচ্ছ। এমনভাবে নানান আকার সাজিয়ে দেখো না কে ধরা দেয়।



কাগজের খেলনা : ভেড়া

কারিগর

আজ শুরু করছি কাগজের বোর্ড দিয়ে খেলনা তৈরির কাজ। স্কুলের প্রজেক্টের কাজে যেমন লাগবে, তেমন করতেও আনন্দ পাবে।

এই কাজের জন্যে দরকার—কাঁচি, নরুন, বোর্ড, আঠা, রঙিন কাগজ, তুলি আর রং।

যে-খেলনা করতে চাও, তার ছক করে নিয়ে ছাপ তুলে নাও বোর্ডে। ছাপ তোলা শেষে (ক-ছবি) কাঁচি দিয়ে কেটে বার করে নাও। এবার ভেড়ার পা (খ-ছবি) আর কানের (গ-ছবি) জন্য একইভাবে কেটে বার করে নাও।

জেনে রাখো—(১) বোর্ড বাছার সময় মোটা ধরনের নেবে। (২) যে-কোন বোর্ডেই চলবে কিন্তু সাদা হলে ভাল। (৩) এই ধরনের কাজের জন্য যে আকার ভাববে তা যেন খুব সোজাভাবে ভাবা হয়। (৪) খুব সরু কাটার জন্যে নরুন ব্যবহার করবে। (৫) নরুন দিয়ে কাজ করার সময় বোর্ডের নীচে কাঁচ বা শক্ত কিছু রেখে নিও।




ছোটদের এক পার্টিতে চলছে আনন্দ হুল্লোড়।
একটা বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছে
নিউট্রিন বাম্বী আর বাচ্চাটি গভীর সমুদ্রে এক ডোবা জাহাজে তল্লাশ চালাচ্ছে
ওরা হঠাৎ এক গুপ্তধন আবিষ্কার করে চেঁচিয়ে উঠলো "ইউরেকা! দারুণ জিনিস পেয়েছি, দেখ?"
ওরা যখন চটপট নিউট্রিনের ব্যাগ সরাচ্ছে...
হাঙর দেখে বাম্বী বুদ্ধি করে এক ব্যাগ নিউট্রিন হাঙরের হাঁ-এর মধ্যে ছুঁড়ে দিল।
বাম্বী ও বাচ্চাটি চটপট উপরে উঠে আসছে...
হঠাৎ... "আরে! ওঠ... জেগে ওঠ!"
চেখে দেখ, নিউট্রিনের কি মজাদার স্বাদ
নিউট্রিন
চাকুম চুকুম মিষ্টি
খাসা দিয়ে ঠাসা
nutrine

Regd No WB|CC 264

ANANDAMELA 30 January 1980

